আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুখপত্র

পবিত্র মাহে রমজান বিশেষ সংখ্যা

মাসিক ১৮৪

সুন্নীবার্তা

SUNNI BARTA

১৮৪ তম সংখ্যা জুন'১৬
রমজান ১৪৩৭ হিজরী

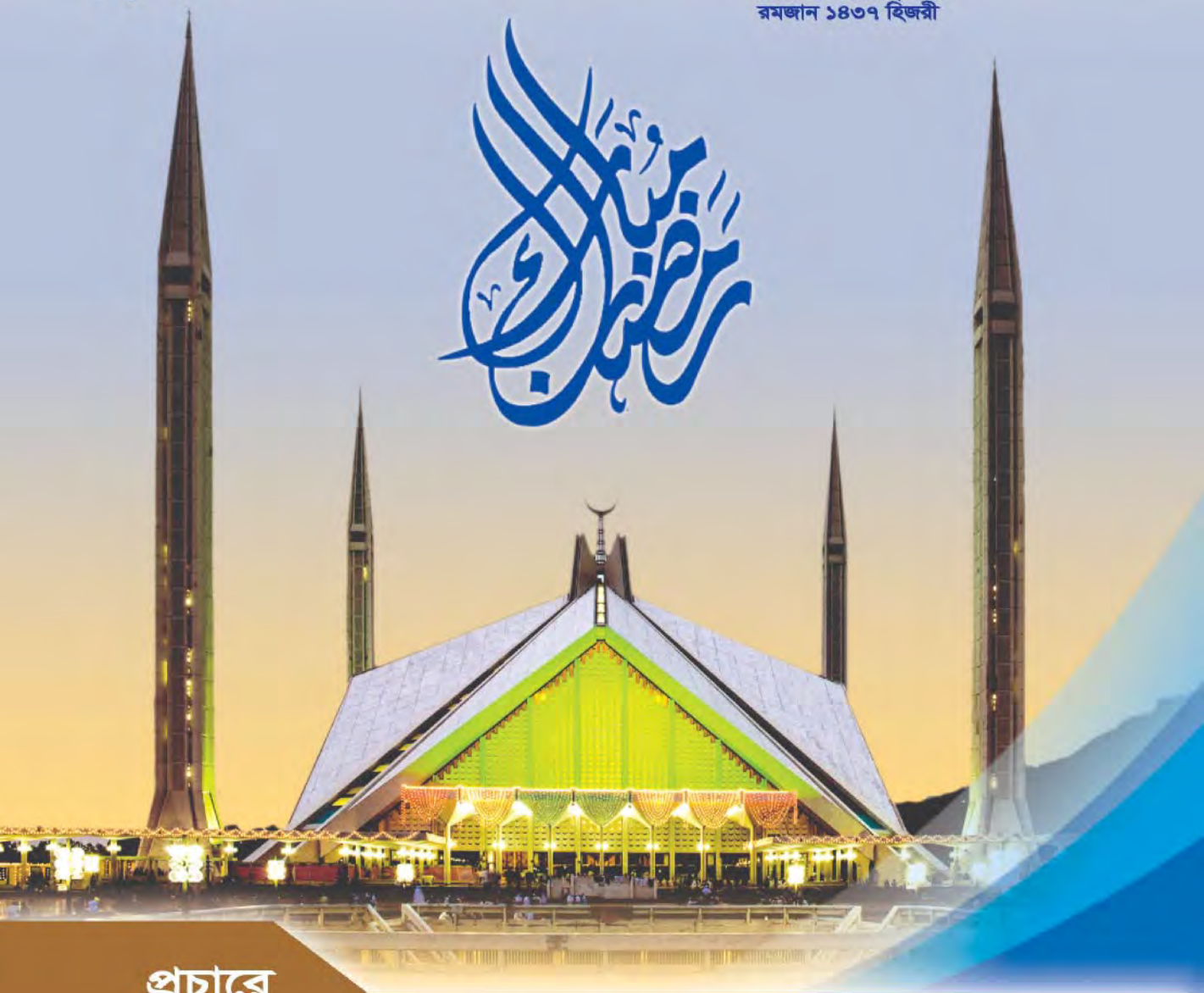

প্রচারে

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)

AHLE SUNNAT WAL JAMA'AT (BANGLADESH)

E-mail :hafej_ma.jalil@yahoo.com. Website : www.sunnibarta.com

নং- জেপ্রঢা/প্রকা:/২০০৭/০৭

মাসিক
সুন্নীবার্তা
SUNNI BARTA

১৫.০০ টাকা মাত্র

প্রতিষ্ঠাতা
অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আব্দুল জলিল (রা:)
এম.এম-এম.এ-বিসিএস

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মুফতী মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন
খতীব, গাউছুল আযম জামে মসজিদ, শাহ্জাহানপুর, ঢাকা।

সহকারী সম্পাদক
ডঃ এ্যাভোকেট মাওঃ আব্দুল আউয়াল
প্রেসিডিয়াম সদস্য , আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবুল হাশেম
প্রেসিডিয়াম সদস্য, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)

নির্বাহী ও সার্কুলেশন সম্পাদক
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুর রব
প্রেসিডিয়াম সদস্য, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)
যুগ্ম-পরিচালক (অবঃ) বাংলাদেশ ব্যাংক
ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

টাকা প্রেরণ ও যাবতীয় যোগাযোগ ঠিকানা
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুর রব
"মা নীড়" ১৩২/৩ আহমদবাগ, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪
ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬
E-mail:sunnibarta11@yahoo.com

অফিস নির্বাহী
মুহাম্মদ সেকান্দর হোসেন সুমন
সভাপতি, বাংলাদেশ যুবসেনা। মোবাইল ঃ ০১৭১৬৫৭৩৩৩৩

মহিলা অঙ্গন
সৈয়দা হাবিবুন্নেছা দুলন

উপদেষ্টা পরিষদ
- ডঃ জালাল আহম্মেদ
- অধ্যাপক আলহাজ্ব এম.এ. হাই
- ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ কুদরত উল্লাহ
- আলহাজ্ব মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন
- আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইকবাল

সহযোগিতায়
✡ কাজী মাওলানা মোবারক হোসাইন ফরাজী আল-কাদেরী
✡ এ্যাডভোকেট দেলোয়ার হোসাইন পাটোয়ারী আশরাফী
✡ অধ্যক্ষ ডঃ এম.এম. আনোয়ার হোসাইন এ্যাডভোকেট
✡ আলহাজ্ব শাহ আলম ✡ মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন
✡ আলহাজ্ব সফিকুর রহমান পাটওয়ারী
✡ এ্যাভোকেট জালাল উদ্দিন ✡ আলহাজ্ব মোঃ জামাল মিয়া
✡ মুহাম্মদ আবদুল মতিন ✡ আলহাজ্ব গোলাম কিবরিয়া
✡ মোঃ হাবিবুর রহমান ✡ মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
✡ আলহাজ্ব আবদুল মালেক ✡ মোঃ আবু তাহের
✡ মোঃ আবু সাঈদ ✡ মোঃ রফিকুল ইসলাম
✡ আযহারুল ইসলাম ✡ মোঃ ইয়াসিন আলী

সৌজন্য হাদিয়া

☛ বাংলাদেশ (প্রতি কপি)	১৫ টাকা মাত্র
☛ যুক্তরাজ্য (বার্ষিক)	£ ১২.০০
☛ যুক্তরাষ্ট্র (বার্ষিক)	৳ ২৪.০০
☛ সৌদীআরব (বার্ষিক)	S.R. ৪৮.০০
☛ কুয়েত (বার্ষিক)	Dinar ১২.০০
☛ ইউরোপীয় ইউনিয়ন (বার্ষিক)	Euro ১৫.০০

প্রচারে ঃ আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)
স্বত্বে ঃ সুন্নী ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স

বিজ্ঞাপনের হার ঃ পূর্ণ পৃষ্ঠা-৩০০০ (তিন হাজার) টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা-১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) টাকা, কোয়াটার পৃষ্ঠা-৭৫০ টাকা

ডাঃ দিলরুবা ইয়াসমিন কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল্ কারনী প্রিন্টার্স, ১০০/এ, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।
ফোন ঃ ৯১১১৬০৭, E-mail : hafez_ma.jalil@yahoo.com. Website: www.sunnibarta.com

সূচীপত্র

আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়া অর্জনের নাম মাহে রমজান ---------- - ০৩

আহলে হাদিস নামধারীদের ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন : তারাভীহ'র নামায বিশ রাক্'আত, আট রাকাত নয় ---------- - ০৭

রমজানুল মুবারক ---------- - ১৪

মাহে রমাদ্বান, হাফিজুল কোরআন ও সালাতুত তারাবী ---------- - ১৮

কোরআন হাদিসের আলোকে হাযির–নাযির ---------- - ২০

আল কুরআনে মাযহাব মানার দলীল -- - ২৬

হযরত শাহ জালাল (রহমাতুল্লিল আলাইহি)-এর সঙ্গী ৩৬০ আউলিয়াদের নামের তালিকা ---------- - ৩০

সুন্নীবার্তার এজেন্ট ও গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

* দেশী এজেন্সী ঃ ন্যূনতম ১০ কপি - ৩০% কমিশন। ভিপি যোগে প্রেরণ। এক মাসের টাকা অগ্রীম জামানত।
* বিদেশী এজেন্সী ঃ ন্যূনতম ৫ কপি - ৪০% কমিশন। রেমিটেন্সের মাধ্যমে ২৫৯৩ ব্যাংক একাউন্টে টাকা প্রেরণ করবেন। (তিন মাস অন্তর)
* বিদেশী গ্রাহক ঃ বার্ষিক- 12.00, $24.00, SR 48.00, EURO 15.00 & KD 12.00।
* দেশী গ্রাহক ঃ (রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে) বার্ষিক ২০০ টাকা মানি অর্ডার যোগে অগ্রিম টাকা প্রেরণ।
* নাম, গ্রাম, ডাকঘর ও জেলার নাম স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে।

বিদেশী গ্রাহকগণের রেমিটেন্স প্রেরণের ব্যাংক একাউন্ট

Md. Abdur Rab
SB A/C 005012100105341
United Commrcial Bank Ltd.
Mohammadpur Branch, Dhaka-1207

দেশী গ্রহক, এজেন্ট, বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যোগাযোগ এবং মানি অর্ডারের টাকা পাঠানোর ঠিকানা

মোহাম্মদ আবদুর রব
মা নীড়, ১৩২/৩, আহমদবাগ, সবুজবাগ, ঢাকা-১২০৭।
ফোনঃ ৭২৭৫১০৭, মোবাইলঃ ০১৭২০ ৯০৬ ৯৯৬

সম্পাদকীয়

মোবারক হো মাহে রমজান

বছর ঘুরে আবারো এলো মাহে রমজান। এসেছে রহমত, মাগফিরাত আর নাজাতের বার্তা নিয়ে। মাহে রমজান একজন মুমিনের জন্য অনেক বড় নিয়ামত। পবিত্র কুরআনসহ প্রসিদ্ধ আসমানী কিতাব সমূহ নাযিলের মাস এ মাহে রমজান। রমজানের আগমনে রহমতের দ্বার খোলে যায় আর ইবলিশ শয়তান হয় শৃঙ্খলাবদ্ধ। তাই আমাদের সমাজে অপরাধের প্রবণতা অপেক্ষাকৃত কমে যায়। কিন্তু তারপরও থেকে যায় কিছু দুঃখজনক চিত্র। সমাজের এক শ্রেণীর লোক একদিকে রোযা রাখে অপর দিকে মিথ্যাবলা, প্রতারণা, ধোকাবাজি, ওয়াদা খেলাপী ইত্যাদি শরিয়ত গর্হিত কাজ হতে বিরত থাকেনা। আবার কেউ এক মাসের জন্য নিজের হোটেলকে বানিয়ে ফেলে হিন্দু হোটেল। আমরা একবারও চিন্তা করিনা রিজিক দেওয়ার মালিক আল্লাহ। আর আল্লাহ তায়ালা নারাজ হলে সবশেষ। পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে এই প্রার্থনা যে - রমজানের রোযার মাধ্যমে আমাদেরকে মুত্তাকী এবং আমলদার মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার তৌফিক দান করুন। আমিন

০৮ জুন ২০১৬

রোজার নিয়তঃ নাওয়াইতুয়ান আছুম্মা গাদাম মিন্ শাহরি রামাদ্বানাল মুবারাকা ফারদাল্লাকা ইয়া আল্লাহু ফাতাকাব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আনতাছ ছামিউল আলীম।

ইফতারের দোয়াঃ আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু লাকা ওয়া আলা রিজকিকা আফতারতু বিরাহ্মাতিকা ইয়া আরহামার রা-হিমীন।

তারাবীহ নামাজের নিয়তঃ নাওয়াইতুয়ান উচ্ছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকাতাই ছালাতিত্ তারাবিহ সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলাজ্বিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

তারাবীহ নামাজের দোয়াঃ সুবহানাযিল মূলকি ওয়াল মালাকুতি সুবহানাযিল ইয্যাতি, ওয়ালআযমাতি, ওয়াল হাইবাতি, ওয়াল কুদরাতি, ওয়াল কিবরিয়ায়ী, ওয়াল জাবারুতি। সুবহানাল মালিকিল হায়্যিল্লাজি লা ইয়ানামু ওয়ালা ইয়ামুতু আবদান আবাদা। সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রুহ।

আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়া অর্জনের নাম মাহে রমজান

মুফতি মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-রমজান এমন মাস, যাতে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।রমজানে কেবল পবিত্র কুরআনই নাযিল হয় নি; বরং সমস্ড় আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে এই মাসে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর উপর অবতীর্ণ সহীফাসমূহ নাযিল হয় এ মাসের প্রথম তারিখ। তাওরাত নাযিল হয় হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এর উপর এ মাসের ষষ্ঠ দিবসে। ইঞ্জিল নাযিল হয় তেরতম তারিখে, যাবূর নাযিল হয় ১৮ তম তারিখে এবং সর্বশেষ কুরআন করীম নাযিল হয় রাসূলে পাক সাল-লা-হু আলাইহি ওয়াসাল-াম'র উপর এই মাসের ২৭ তম তারিখ রাতে। নবীপাক সাল-লা-হু আলাইহি ওয়াসাল-াম এই মাসকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম দশদিন হল রহমতের দশক,দ্বিতীয় দশ দিন মাগফিরাতের এবং শেষের দশ দিন হল দোযখ ও আযাব হতে নাজাত বা মুক্তির্ দশক। তাই রমজানের প্রথম দশ দিনে আল-াহ পাক তার বান্দাদেরকে বিশেষ ধরণের রহমত দানে ধন্য করেন। আর যারা সত্যিকারার্থে রোযা পালন করে, তাদেরকে ব্যাপকহারে রহমত বা দয়া করে থাকেন। তা কেবল রমজানের উসিলায়।

অপর হাদিসে রয়েছে, এই মাসের প্রথম তারিখেই মহান আল-াহ কিরামান-কাতিবীন ফেরেশতাদেরকে ডেকে নির্দেশ প্রদান করেন, যাতে এ মাসে রোযা পালনকারীদের আমলনামায় কেবল সাওয়াবই লেখা হয় এবং কোন গুনাহ যাতে লেখা না হয়। অধিকন্ড় আল-াহ তায়ালা রোযাদারের পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

মুফাসসিরকুল শিরোমণি হযরত আবদুল-াহ ইবনে আব্বাস রদ্বিআল-াহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলে পাক সাল-লা-হু আলাইহি ওয়াসাল-ামকে বলতে শুনেছি যদি আমার উম্মতরা জানত যে, মাসের মধ্যে কী মাহত্ম্য রয়েছে, তাহলে তারা আল-াহর দরবারে কেবলই প্রার্থনা করত। হায় আল-াহ! যদি পুরো বৎসরটাই রোযা হত তাহলে কতই না ভাল হত। কেননা এ মাস সাওয়াবে ভরপুর, যাবতীয় ইবাদত এ মাসে কবুল হয়ে যায়। ব্যাপকহারে পাপ মার্জনা করা হয় সর্বোপরি রোযাদারের জন্য জান্নাত নিজেই প্রত্যাশী হবে আল-াহর দরবারে ফরিয়াদ জানায়।

আত্মশুদ্ধির মাস : মানুষের শরীরের চালিকাশক্তি হল তার আত্মা। আত্মা দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে আর শরীরের অন্যান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তা বাস্ড়বায়নে এগিয়ে আসে। সুতরাং আত্মা পরিশুদ্ধ হলে সে ব্যক্তি সৎকাজে ব্রতী হয়। আর আত্মা অশুদ্ধ হলে মানুষ অসৎ বা অন্যায় কাজে পা বাড়াতে দ্বিধাবোধ করে না। সুতরাং সচ্চরিত্র অর্জনে আত্মারেই ভূমিকা প্রধান। আর সে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য আল-াহ পাক রোযার বিধান প্রবর্তন করেন। আত্মা কে পরিশুদ্ধ করার অন্যতম উপায় হল উপবাস থাকা। রোযার রহস্য বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত শায়খ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল-াহি আলাইহি বর্ণনা করেন, রমজান শব্দটি এসেছে 'রমজুন, মূলধাতু হতে যার অর্থ হল জ্বালিয়ে ফেলা, তথা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা। আর আত্মার পরিশুদ্ধরা অর্জিত হয় উপবাসের মাধ্যমে মানবসৃষ্টির উপাদান সমূহের মধ্যে আল-াহ তায়ালা সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছিলেন আকল (বিবেক) এবং নাফস (আত্ম)। অত:পর আকলকে সম্বোধন করে প্রশ্ন করেছিলেন তুমি কে? আর আমি কে? আকল উত্তর দিল আপনি আমার মহামান্য প্রভু এবং সৃষ্টিকর্তা। আর আমি আপনার আনুগত এক দুর্বল বান্দা। আকল এর উত্তর শুনে আল-াহ পাক খুশী হয়ে গেলেন। অত:পর নাফ্সকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? আমি কে? নাফস বলল আমিই আমি, তুমিই তুমি। নাফস এর এরূপ দাম্ভিকতাপূর্ণ জবাবে আল-াহ অসুন্ড়ষ্ট হলেন এবং ফেরশতাকে আদেশ দিলেন এই অকৃত নাফসকে পরিশুদ্ধ করার জন্য। আদেশ পেয়ে ফেরেশতা ঐ নাফসকে এক বৎসর মতান্ড়রে একশ বৎসর উত্তপ্ত আগুনে পোড়ালেন। অত:পর আল-াহর সামনে হাজির

করলেন। এবার আল-াহ প্রশ্ন করলেন, এখন বল তুমি কে আর আমি কে? নাফসের অহংকার একটুকু হ্রাস পেল না। বরং পূর্বের ন্যায় দম্ভভরে বলে উঠল। তুমি তুমিই আর আমি আমিই। আল-াহ বলেন, একে আরো শাস্তি দেয়া হোক। যাতে তার অপ্রশমিত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। ফেরেশতা এবার তাকে প্রচন্ড ঠান্ডা পানিতে এক বৎসর মতাস্তরে একশ। বরাবরের মতোই রয়ে গেল। শেষবারের মতো আল-াহ ফেরেশতাদরেকে আদেশ দিলেন, এই নাফসকে যদি নরম করতে তাহলে একটা উপযুক্ত শাস্তি রয়েছে আর তা হল, একে এক মাস খাবার দেয়া বন্ধ রাখা হোক। আদিষ্ট ফেরেশতা ঠিক তাই করলেন। দেখা গেল, কয়েক দিন যেতে না যেতেই তার ভিতর পরিবর্তন শুর হয়েছে। একমাস পর উপবাসের কারণে একেবারেই দুর্বল হয়ে গেল। চিরতরে বিদায় নিল। এবার আল-াহ প্রশ্ন করলেন, তুমি কে? আর আমি কে? অত্যন্ত আনুগত্য সহকারে এবার নফস বলল, হে প্রভু! আপনি আমার মহান সৃষ্টিকর্তা, আর আমি দুর্বল বান্দা।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হলো, যে নাফ্সকে আগুন আর ঠান্ডা পানি দুর্বল করতে পারে নি? তাই নাফস দুর্বল এবং পরিশুদ্ধ হয়ে যায় এক মাস উপবাসের কারণে। মানুষের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ আর বিশুদ্ধতার জন্যই মূলত: এই একমাস রোযার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে।

রোযা তাকওয়া অর্জনের অনন্য উপায় :

মুসলমানদের সার্বিক জীবনে রোযার অশেষ গুর ত্ব রয়েছে। এ রোযা কেবল উম্মতে মুহাম্মাদী সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসালাম এর উপরই ফরজ ছিল না। বরং হযরত আদম আলাইহিস সালাম হতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সকল উম্মতের উপরও রোযা ফরজ ছিল। তবে পূর্ববতী নবীদের উম্মতের সাথে উম্মতে মুহাম্মাদী সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসালাম ফরজকৃত রোযার সংখ্যা, সময়সীমা ইত্যাদিতে পার্থক্য রয়েছে। মূলত : রোযা বা সিয়াম সাধনা এক কষ্টসাধ্য ইবাদত। আর এ রোযা সম্পাদনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদেরকে খোদাভীর করা। এ পর্যায়ে পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারা ১৮৩ নং আয়াতে ইরশাদ রয়েছে, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববতীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী (খোদাভীর) হতে পার।

রোযা হল আরবি 'সওম, এর ফার্সি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ হল বিরত থাকা। রমজান মাসকে আল-াহ তায়ালা বিশেষ ভাবে সম্মানিত ঘোষনা করেছেন। হাদিসে কুদসীতে আছে- সাধারণত; অন্যান্য ইবাদতের পরিমাণ দশগুন হতে সাতশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। কিন্তু রোযা আমারই, এর প্রতিদান আমিই। সুতরাং বুঝা গেল রোযার প্রতিদানের নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই। স্বয়ং আল-াহ তার দায়িত্ব নিজ কুদরতি হাতেই গ্রহণ করেছেন। তার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে- প্রথমত : এই রোযা আর অন্যান্য ইবাদতের মধ্যকার পার্থক্য সস্পষ্ট। কারণ, অন্যান্য ইবাদতে লোক দেখানোর কিছুটা অবকাশ রয়েছে। কিন্তু রোযাতে তা নেই। যেমন কেউ নামায পড়লে লোকেরা তাকে নামাযী হিসেবে আখ্যায়িত করে। আর হজ্ব করলে তাকে হাজী সাহেব বলে সম্ভোধন করে। যে ব্যাক্তি যাকাত দেয় তারও একটি সামাজিক পরিচিতি থাকে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি রাতের গভীরে ঘুম থেকে ওঠে রোযার উদ্দেশ্যে সেহরী খায় এবং সারাদিন রোযা রাখে তা কেউ বুঝতে পারে না। কারন, লোকচক্ষুর অন্তরালে কিছু খেলে তা জানার সাধ্য কারো নেই। সুতরাং রোযাদার রোযা রাখে একমাত্র আল-াহর ভয়ে। তাই রোযার পুরস্কার আল-াহ তায়ালা নিজের কুদরতি হাতেই প্রদান করেন।

রোযা ধৈর্যের পরীক্ষা :

ধৈর্য মানব চরিত্রের একটি মহৎগুণ। আল-াহ পাক সূরা বাকারায় ইরশাদ করেন - নিশ্চয়ই আল-াহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ, কিন্তু চার ব্যক্তি ক্ষতি গ্রস্থ নয়- (১) যারা আল-াহ এবং রসূল এর উপর ঈমান এনেছে (২) সৎকাজ করেছে (৩) যারা একে অপরকে হকের অসিয়ত দেয় এবং (৪) যারা পরস্পর ধৈর্যের পরামর্শ দিয়ে থাকে (সূরা আসর)। আল-াহ পাক নবীদের নবুয়্যত প্রদানের প্রাক্কালে সবর বা ধৈর্য্যের পরীক্ষা নিয়েছেন। মানবজাতির আদি পিতা হযরত আদম

আলাইহি সালাম থেকে শুর“ করে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, হযরত ইসমাঈল আলাইহি সালাম, হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম সহ অসংখ্য নবি-রাসূল কে আল-াহ তায়ালা ধৈর্যের চরম পরীক্ষা করেছেন। ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে তাদেরকে সহ্য করতে হয়েছে তৎকালীন কাফির- মুশরিকদের অশালীন আচরণ আর অকথ্য নির্যাতন। কিন্তু মুহূর্তের জন্য ও তারা এতটুকু ধৈর্য হারা হন নি। বরং অকাতরে আল-াহর দরবারে ফরিয়াদ করেছেন হে আল-াহ, তুমি তাদেরকে হেদায়াত দান করো, তারা না বুঝেই এহেন আচরণ করেছে। এভাবে দেখা যায় প্রতি যুগে আল-াহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছে ধৈর্যের মাধ্যমে এবং তাদের সফলতা অর্জনের নেপথ্য শক্তিই এই 'ধৈর্য।

ধৈর্য নামক মহৎ গুনটি মানব জীবনে অর্জিত হয় পবিত্র রমজান মাসেই। একজন রোযাদার যখন ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ে, তখন সে এদিক সেদিক করতে থাকে। অথচ, তার সামনেই রয়েছে নানা ধরনের মজাদার খাবার ও পানীয়। ইচ্ছা করলেই হাত বাড়িয়ে খেয়ে ফেলতে পারে, কিংবা লুকিয়ে কিছু খেয়ে ফেললেও তা বুঝা সম্ভব নয়। কিন্তু রোযাদার কি তা করে? নিশ্চয়ই না। বরং ধৈর্যের মাধ্যমে নিজেদের প্রবৃত্তির তাড়নাকে সংযত রাখে। আর তা একমাত্র আল-াহর ভয়ে। ফলে রোযাদরা আল-াহর নৈকট্যলাভে সক্ষম হয়।

সাহরী মহা ফযিলতপূর্ণ ইবাদত :

রোযাদার রোযা পালনের মানসে শেষ রাত্রিতে যে খাবার খাওয়া সুন্নাত ও সাওয়াবের কাজ। এ পর্যায়ে হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে- সাহরী খাও, এতে অতিশয় বরকত রয়েছে। এই সাহরী পেটভর্তি করে খাওয়া শর্ত নয়, বরং দু'এক লোকমা খেলেও সাওয়াব পাওয়া যায়। যারা সাহরী খাওয়ার সময় পায়না, তারা অন্তত এক গ-াস পানি পান করে নিবে। উৎকৃষ্ট সময় হল রাত্রির শেষ ভাগে তথা সুবহি সাদিকের সামান্য পূর্বে। আর কেউ যদি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখল যে, সুবহি সাদিক হয়ে গেছে তাহলে সাহরী না খেয়েই সারাদিন রোযা পালন করতে হবে।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রদ্বিআল-াহু তায়ালা আনহুম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- মহানবী সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম ইরশাদ করেন, যখন রোযাদার সেহরীর উদ্দেশ্যে শেষ রাতে জাগ্রত হয়ে বিছানায় নড়াচড়া করে এদিক-সেদিক ফিরে, তখন এক ফেরেশতা বলতে থাকে হে আল-াহর বান্দা! জেগে ওঠো, আল-াহ পাক তোমার জীবন বরকতময় কর“ন। অত:পর রোযাদার যদি তাহাজ্জুদের নামায এর নিয়তে উঠে দাঁড়ায়। তখন বিছানা তার জন্য দোয়া করে, হে আল-াহ! তুমি এ বান্দাকে বেহেশতে সুউচ্চ বিছানা দান কর“ন। অত:পর সে যখন কাপড়-চোপড় পরিধান করে এই কাপড় দোয়া করতে থাকে, হে আল-াহ! তুমি এই বান্দাকে বেহেশতী পোষাকে সুসজ্জিত করো। অত:পর যখন জুতা বা স্যান্ডেল পরিধান করে সেগুলি দোয়া করে, হে আল-াহ! তুমি এই বান্দাকে সিরাতুল মুস্ড় কীম এর উপর অটল ও অবিচল রাখো। নামায আদায়ান্তে আল-াহ দরবারে যে দোয়াই করা হয় সব কবুল হয়। সর্বশেষ যখন সাহরী খাওয়ার উদ্দেশ্যে বাসন হাতে নেয়, তখন ওই বাসন ফরিয়াদ করতে থাকে হে আল-াহ! তুমি এ বান্দাকে বেহেশতী খাবার দিয়ে পরিতৃপ্ত করো। আর এদিকে আল-াহ পাক স্বয়ং আহবান করেন- হে আমার বান্দা! আজকের এ শুভ মুহূর্তে তোমার কাজ হলে দোয়া করা আর আমার কাজ হল দোয়া কবুল করা। তোমার কাজ গুনাহ মাফ চাওয়া আর আমার কাজ হল গুনাহ মাফ করা।

ইফতার রোযাদারের সুখময় সন্ধিক্ষণ :

দিনের অবসানে সূর্য ক্র“মান্বয়ে পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লো,লাল হয়ে এলো তার চেহারা, অল্পক্ষণ পরেই সে হারিয়ে যাবে সেদিনের মত। ঠিক এমন এক মুহূর্তে সাজানো হল হরেক রকম খাবার। ঝাল-মিষ্টি, কত বৈচিত্রময় খাবারের সমারোহ শোভা পাচ্ছে দস্ড় রখানায়। সবক'টিই আল-াহর নেয়ামত। এসব সামনে নিয়ে কেবলি তাকিয়ে আছে রোযাদর। সারাদিন সে কিছুই খেতে পারে নি; ক্ষুধার তাড়নায় পেটের অবস্থা কাহিল। অথচ সামনেই রয়েছে অঢেল খাবার। হাত বাড়ালেই যেন মুখে এসে যাচ্ছে, কিন্তু এতটুকু লোভ সংবরণ করার যে ধৈর্য্য এবং আদর্শ -তা কেবল রোযার

www.sunnibarta.com

সম্মানে। তাই আল-াহ্ পাক ফেরেশতাদের বলেন- দেখ, দেখ, আমার বান্দা আমার ভয়ে এসব খাচ্ছেনা। সুতরাং তোমরা আমার কাছে তাদের গুনাহ্ মাফ চাও। ফেরেশতাগণ সমস্বরে আল-াহ্র দরবারে ফরিয়াদ করবে- আল-াহ্,তোমার খেয়েই না খেয়ে সারাদিন অতিবাহিত করল আর অসংখ্য সু-স্বাদু খাবার হাতের মুঠোয় পাবার পরেও খাওয়ার সাহস করছেনা। সুতরাং এ কারণে তুমি তাদের সমস্ড় গুনাহ্ মাফ করে দাও। এদিকে প্রহর গুণতে গুণতে সূর্য ডুবে গেল। চতুর্দিকে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে আযানের সুললিত ধ্বনি। এটা রোযাদারের আনন্দময় মুহূর্ত। কোথাও মা-বাবা, ভাই-বোন আর কোথাও বা বন্ধু-বান্ধব মিলে ইফতার করছে। এরপর মসজিদে গিয়ে মুসলি-দের ভীড়। কী এক অপূর্ব আমেজ। ফেরেশতারা দেখে কেবলই হাসছে আর আল-াহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছে। এ পর্যায়ে হাদিসে কুদসীতে ইরশাদ হয়েছে- রোযাদারের দু'টি আনন্দ। একটি ইফতারের সময়। অন্যটি রাব্বুল আলামীনের একাস্ড় দিদার লাভের সময়।

অনুভূতি ও ভ্রাতৃত্বের অনুপম নিদর্শন রোযা :

চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিতের বেদনা বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশিবিষে দংশেনি যাবে?

যে ব্যক্তি কোন দিন অভুক্ত থাকে নি, সে কোন দিন বুঝেনা গরীব দু:খী মানুষের অভাবের যন্ত্রণা। দু:খের যাদের জীবন গড়া, অনাহারে অর্ধাহারে যাদের দিনাতিপাত- তাদের কষ্ট-যাতনা কী জ্বালাময় তা অনুভবের এক উপযুক্ত সময় মাহে রমজান। রমজানের রোযা পালনে ধনী গরীব সবাই সমান অংশীদার। দিনের বেলায় অভাব অনটনে জর্জরিত লোকেরা যেমন উপবাস জীবন যাপন করে কি জ্বালা! আর তখন থাকেনা তাদের মাঝে কোন ব্যবধান। ধনীর হৃদয়ে অনুভূত হয় গরীবের দু:খ যাতনা। ফলে বাড়তে থাকে তাদের মাঝে সহানুভূতি আর সম্প্রীতি। ভ্রাতৃত্বের বন্ধন হয়ে ওঠে আরো সুদৃঢ় এবং সর্বশেষে তা চুড়াস্ড় রূপ লাভ করে পবিত্র ঈদের দিনে। তাই রোযা হচ্ছে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের বন্ধু।

সিয়ামের মাধ্যমে মুসলিম মিল-াতের মধ্যে এমন ভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি হয় যার দৃষ্টাস্ড় বিশ্বের কোথাও পাওয়া বিরল। সেহরী-ইফতার তারাবীহ্ ইত্যাদিও শুভমুহূর্তে সৌহার্দ্য আর সম্প্রীতির যে নিদর্শন দেখা।

www.sunniberta.com

এল.এল.বি ১ম পর্বে ২০১৫-২০১৬ ইং সেশনে ভর্তি চলছে

বঙ্গবন্ধু ল' কলেজ

(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত)

"বিগত ১৫ বছর যাবত সারা বাংলাদেশে সর্বোচ্চ।
[২০১৫ইং সালের পাশের হার ৯৮%]"

ভর্তি চলছে

প্রফেসর ডঃ এম.এম. আনোয়ার হোসেন

বঙ্গবন্ধু ল' কলেজে (পীর জঙ্গী মাজারের নিকটে), মতিঝিল,ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০১৭১১১৭৬১২৭, ০১৫৫২৪৬৯১৪৫, ০১৭১১১৪৬৩৫২

www.sunnibarta.com

আহলে হাদিস নামধারীদের ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন

তারাবীহ্'র নামায বিশ রাক্'আত, আট রাকাত নয়

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান

রসূল-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সমগ্র উম্মত এ কথার উপর একমত যে, 'তারাভীহ'র নামায আট রাক্'আত নয়।' বাকী রইলো- এ নামায কি বিশ্ রাক্'আত, না আরো বেশী! অধিকাংশ (প্রায় সব) মুসলমান বিশ রাক্'আত পড়েন, কেউ কেউ চল্লিশ রাক্'আত পড়েন। গায়র মুক্বাল্লিদ (লা-মাযহাবী তথা ওহাবী) হচ্ছে ওই ফির্ক্বা বা দল, যাদের নিকট নামায ভারী ও কষ্টকর। নিছক নাফসের উপর বোঝা মনে করে 'তারাভীহ্' শুধু আট রাক্'আত পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আর তাদের পক্ষে কিছু সংখ্যক বর্ণনাকে বাহান্ন অজুহাত সাব্যস্ত করে। এ জন্য আমি এ মাসআলাকে দু'টি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করবো। প্রথম পরিচ্ছেদে বিশ্ রাক্'আত তারাবীহর পক্ষে প্রমাণাদি এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ওহাবী-লা-মাযহাবীদের আপত্তিগুলো উল্লেখ করে সেগুলোর জবাব (খন্ডন) উল্লেখ করবো।
আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করুন! আ-মী-ন।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ

বিশ রাক্'আতারাভীহ্ প্রমাণাদি বিশ রাক্'আত তারাভীহ্ পড়া- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা-ই কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম ও আম মুসলমানদের সুন্নাত। আট রাক'আত তারাবীহ্ সুন্নাতের পরিপন্থী। দলীলাদি নিম্নরূপঃ

হাদীস নম্বর ১-৫

ইবনে আবী শায়বাহ্ ও তাবরানী 'কবীর'-এ, বায়হাক্বী, আবদ্ ইবনে হুমায়দ এবং ইমাম বাগাভী সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনাকরেছেন-

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ فِىْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً سِوَى الْوِتْرِ وَزَادَ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ غَيْرِ جَمَاعَةٍ

অর্থঃ নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে বিশ রাক্'আত পড়তেন- ব্যতীত। ইমাম বায়হাক্বী এতটুকু বেশী লিখেছেন- জামা'আত ব্যতীত তারাভীহ্ পড়তেন।

এ হাদীস শরীফগুলো থেকে বুঝা গেলো যে, খোদ্ হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিশ রাক্'আত তারাভীহ্ পড়তেন। যেসব রেওয়ায়তে এসেছে যে, তিনি শুধু তিন দিন তারাভীহ্ পড়েছেন, সেগুলোতে জমা'আত সহকারে পড়া বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জমাআত ব্যতীত তো সব সময় পড়তেন, জমা'আত সহকারে শুধু তিনদিন পড়েছেন। সুতরাং হাদীস শরীফগুলোতে পরস্পর কোন বিরোধ নেই।
এও বুঝা গেলো যে, তারাভীহ্ 'সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ 'আলাল আয়ন'। (অর্থা শরিয়তের বিধানাবলী বর্তায় এমন প্রত্যেকের জন্য তারাভীহর নামায সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্') কারণ, হুযূর-ই এ নামায সব সময় পড়েছেন এবং লোকজনকে উৎসাহ্ও দিয়েছেন।

হাদীস নম্বর-৬

ইমাম মালিক হযরত ইয়াযীদ ইবনে রূমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

كَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ فِىْ زَمَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ فِىْ رَمَضَانَ بِثَلٰثٍ وَّ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً

অর্থঃ হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর যামানায় রমযানে লোকেরা তেইশ রাক্'আত নামায পড়তেন। এ থেকে দু'টি মাস্আলা প্রতীয়মান হয়ঃ এক. তারাভীহ্ বিশ রাক্'আত এবং দুই. বিতর তিন রাক্'আত। এ কারণে সর্ব মোট তেইশ রাক্আত হয়েছে।

হাদীস নম্বর-৭

ইবনে মুনী' হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন-

اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَمَرَهٗ اَنْ تُصَلِّىْ بِاللَّيْلِ فِىْ رَمَضَانَ ـ قَالَ اِنَّ النَّاسَ يَصُوْمُوْنَ النَّهَارَ وَلاَ

يُحْسِنُوْنَ اَنْ يَّقْرَؤُا فَلَوْقَرَأْتَ عَلَيْهِمْ بِاللَّيْلِ قَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هٰذَا شَئٌ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ فَقَدْ عَلِمْتُ وَلٰكِنَّهُ حَسَنٌ فَصَلّٰى بِهِمْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً -

অর্থ: হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে নির্দে শ দিয়ে বলেছেন ''তুমি লোকজনকে রমযানের রাতে তারাভীহর নামায পড়াবে। কেননা, লোকেরা দিনের বেলায় রোযা রাখে এবং ক্বোরআন করীম উত্তমরূপে পড়তে পারে না। সুতরাং উত্তম হবে যদি তুমি তাদেরকে রাতে ক্বোরআন পড়ে শুনাও।'' হযরত উবাই আরয করলেন, ''হে আমীরুল মু'মিনীন, এটা ওই কাজ, যা ইতোপূর্বে ছিলো না'' তিনি বললেন, ''আমি জানি; কিন্তু এটা উত্তম কাজ। সুতরাং হযরত উবাই তাঁদেরকে বিশ রাক্'আত পড়িয়েছেন।

এ হাদীস শরীফ থেকে কয়েকটা মাসআলা প্রতীয়মান হয়-

এক. হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খিলাফতের পূর্ব থেকে মুসলমানদের মধ্যে তারাভীহ্ জারী ছিলো; তবে জমা'আত সহকারে, গুরুত্বের সাথে সব সময় (নিয়মিতভাবে) তারাভীহর নামায পড়ার প্রচলন হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর যমানা থেকে হয়েছে। মূল তারাভীহ্ সুন্নাতে রসূল। আর জমা'আত, গুরুত্ব দেওয়া ও নিয়মিতভাবে পড়া- সুন্নাত-ই ফারূক্বী। (হযরত ওমর ফারূক্বের সুন্নাত।)

দুই. বিশ রাক্'আত তারাভীহর উপর সমস্ত সাহাবীর ইজমা' (ঐকমত) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেননা, হযরত উবাই ইবনে কা'ব সমস্ত সাহাবীকে বিশ্ রাক্'আত পড়িয়েছেন। সাহাবা-ই কেরামও পড়েছেন। কেউ আপত্তি করেননি।

তিন. 'বিদ্'আত-ই হাসানাহ্' (উত্তম বিদ্'আত) ভাল জিনিস। হযরত উবাই ইবনে কা'ব আরয করেছেন, তারাবীহ্র নামায জামা'আত সহকারে নিয়মিতভাবে গুরুত্ব সহকারে পড়াতো ইতোপূর্বে ছিলোনা বিদ্'আত। হযরত ফারূক্বে আ'যম বলেছেন, একেবারে ঠিক কথা, বাস্তবিকই এটা বিদ্'আত; কিন্তু উত্তম।

চার. যে কাজ হুযূর-ই আক্রামের যমানায় ছিলোনা, তা বিদ্'আত; যদিও সাহাবীদের যুগে প্রচলিত হয়। যেমন- তারাভীহর নামায জমা'আত সহকারে আদায় করা। এটা যদিও হযরত ওমর ফারূক্বের যুগে প্রচলিত হয়েছে; কিন্তু সেটাকে 'বিদ্'আত-ই হাসানাহ্' (উত্তম বিদ্'আত) বলা হয়েছে।

হাদীস নম্বর-৯

ইমাম বায়হাক্বী তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে হযরত আবূ আবদুর রহমান সালামী থেকে বর্ণ না করেছেন

اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ دَعَا الْقُرَّاءَ فِيْ رَمَضَانَ وَاَمَرَ رَجُلاً يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ خَمْسَ تَرْوِيْحَاتٍ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَكَانَ عَلِيٌّ يُوْتِرُ بِهِمْ

অর্থ: হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রমযান শরীফে ক্বারীদেরকে ডাকলেন, তারপর একজনকে নির্দে শ দিলেন যেন পাঁচ তারাভীহ বিশ রাকআত নামায পড়ান। হযরত আলী তাদেরকে বিতর পড়াতেন।

হাদীস নম্বর-১০

ইমাম বায়হাক্বী হযরত আবুল হাসানা থেকে বর্ণ না করেন-

اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ اَمَرَ رَجُلاً يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ خَمْسَ تَرْوِيْحَاتٍ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً

অর্থ: হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এক ব্যক্তিকে নির্দে শ দিলেন যেন তিনি পাঁচ তারাভীহ্ অর্থাৎ বিশ রাক'আত নামায পড়ান।

নমুনাস্বরূপ কয়েকটা হাদীস এখানে পেশ করা হলো। অন্যথায় বিশ্ রাক্'আতের পক্ষে হাদীস শরীফ অনেক রয়েছে। আগ্রহ থাকলে হাকীমুল উম্মাহ্ মুফতী আহমদ ইয়ার খান আলায়হির লিখিত 'লুম্'আতুল মাসাবীহ্ ফী রাক্'আ-তিৎ তারাবীহ্' এবং 'সহীহুল বিহারী' পাঠ-পর্যালোচনাকরতে পারেন।

বিবেক বা যুক্তিরও দাবী হচ্ছে তারাভীহর নামায বিশ রাক্'আত, আট রাক্'আত নয়। এরও কয়েকটা কারণ আছে-

এক. দিন ও রাতে ফরয ও ওয়াজিব নামায বিশ্ রাক্'আতঃ সতের রাক্'আত ফরয আর তিন রাক্'আত বিতর ওয়াজিব। রমযান মাসে বিশ রাক্'আত তারাভীহ্ পড়া হলে ওই বিশ রাক্'আত ফরয ও ওয়াজিব নামায

www.sunnibarta.com

পূর্ণাঙ্গ হয়ে যাবে এবং ওইগুলোর মর্যাদা বা গ্রহণযোগ্যতাও বেড়ে যাবে। (কারণ, এ সুন্নাত নামাযগুলো ফরয ও ওয়াজিব নামাযগুলোর ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিকার করবে, কাফফারাহ্ হয়ে যাবে।) সুতরাং আট রাক্'আত তারাভীহ্, ক্বিয়াস তথা যুক্তিরও বিরোধী।

দুই. সাহাবীগণ আলাইহিমুর রিদ্বওয়ান তারাভীহর প্রত্যেক রাক্'আতে এক রুকূ' পরিমাণ ক্বোরআন পড়তেন; বরং ক্বোরআন-ই করীমের রুকূ'কে রুকূ' এজন্য বলা হয় যে, এতটুকু আয়াত পড়ে হযরত ওমর, হযরত ওসমান ও অন্যান্য সাহাবীগণ তারাভীতে রুকূ' করতেন। আর ২৭ রমযানের রাতে ক্বোরআন খতম হতো। আট রাক্'আত হলে ক্বোরআন-ই করীমের রুকূ' সংখ্যা সর্বমোট২১৬ হতো; অথচ ক্বোরআন-ই করীমের রুকূ'র সংখ্যা সর্বমোট৫৫৭। বিশ রাক্'আতের হিসেবে ৫৪০ রুকূ' হয়। কোন ওহাবী আট রাক্'আত তারাভীহ্ মানলে ক্বোরআন করীমের রুকূ'গুলোর এ সংখ্যা দাঁড়ানোর কারণটুকুও বলে দেবেন।

তিন. 'তারাভীহ্' (تراويح) হচ্ছে 'তারভীহাহ্' (ترويحه)-এর বহু বচন। 'তারাভীহাহ্' বলে প্রত্যেক চার রাক্'আতের পর কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম নেয়াকে। যদি তারাভীহ্ আট রাক্'আত হতো, তাহলে মধ্যভাগে শুধু একবার বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ হতো। এমতাবস্থায় এর নাম তারাভীহ্ (বহুবচন) হতো না। 'বহুবচন' আরবীতে কমপক্ষে 'তিন'কে বলা হয়।

উম্মতের আলিমদের আমল সবসময় প্রায়সব উম্মতের আমল বিশ্ রাক্'আত তারাভীহ্ পড়াই চলে আসছে। এখনো এ আমল বলবৎ রয়েছে। হেরমাঈন শরীফাঈন ও সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানগণ বিশ রাক্'আত তারাভীহ্ই পড়ে থাকেন। সুতরাং তিরমিযী শরীফের রমযান মাসে 'রাত জাগরণ করে ইবাদত করার বিবরণ' শীর্ষক অধ্যায়ে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

وَاكْثَرُ اَهْلِ الْعِلْمِ عَلٰى مَارُوِىَ عَلِىٍّ وَعُمَرَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىِّ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ هٰكَذَا اَدْرَكْتُ بَلَدَ مَكَّةَ يُصَلُّوْنَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً

অর্থ: এবং অধিকাংশ আলিমের আমলের উপরই যা হযরত ওমর, হযরত আলী ও অন্যান্য সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম থেকে বর্ণিত। অর্থাৎ বিশ রাক্'আত তারাভীহ্ আর এটাই হযরত সুফিয়ান সওরী, ইবনে মুবারক ও ইমাম শাফে'ঈ আলায়হিমুর রাহ্মাহর অভিমত। ইমাম শাফে'ঈ বলেছেন, আমি মক্কাবাসীদেরকে বিশ রাক্'আত তারাভীহ্ পড়তে দেখতে পেয়েছি। ওমদাতুল ক্বারী শরহে বোখারী': ৫ম খন্ড: ২৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে-

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُوْرِ الْعُلَمَاءِ وَبِهِ قَالَ الْكُوْفِيُّوْنَ وَالشَّافِعِىُّ وَاَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ

অর্থ: ইবনে আবদুল বার বলেন, বিশ রাক্'আত তারাভীহ্ই প্রায় সব বিজ্ঞ আলিমের কথা। এটাই কূফী হযরত গণ, ইমাম শাফে'ঈ এবং অধিকাংশ আলিম ও ফক্বীহগণের অভিমত। বস্তুত এটাই বিশুদ্ধ কথা। এটা হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। এতে সাহাবীগণের কোন বিরোধ নেই। মাওলানা আলী ক্বারী 'শরহে ভিক্বায়াহ্'য় বিশ রাক্'আত তারাভীহ্ সম্পর্কে বলেন-

فَصَارَ اِجْمَاعًا لِمَا رَوَى الْبَيْهَقِىُّ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ كَانُوْا يُقِيْمُوْنَ عَلٰى عَهْدِ عُمَرَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَعَلٰى عَهْدِ عُثْمَانَ وَعَلِىٍّ عِشْرِيْنَ

অর্থ: বিশ রাক্'আত তারাভীহর উপর মুসলমানদের ইজমা' (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেননা, বায়হাক্বী সহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন যে সাহাবা-ই কেরাম ও সমস্ত মুসলমান হযরত ওমর, ওসমান ও আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমের যমানায় বিশ রাক্'আত তারাবীহ্ পড়তেন।

আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী বলেছেন-

اِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلٰى اَنَّ التَّرَاوِيْحَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً

অর্থ: সমস্ত সাহাবী এ কথার উপর একমত যে, তারাভীহ্ বিশ রাক্'আত।

উপরিউক্ত বরাতগুলো থেকে বুঝা গেলো যে, বিশ রাক্'আত তারাভীহ্ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা

আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত। বিশ রাক্'আত তারাভীহর উপর সাহাবা-ই কেরামের ইজমা' হয়েছে। বিশ রাক্'আত তারাভীহ্ পড়া আম মুসলমানদের আমল। বিশ রাক্'আত তারাভীহ্ হারামাঈন শরীফাঈনে পড়া হয়। বিশ্ রাক্'আত তারাভীহ্ বিবেক ও যুক্তির অনুরূপ। বিশ রাক্'আত তারাভীহ্ ক্বোরআনের রুকূ'গুলোর সংখ্যানুরূপ; বরং আজকাল হারামাঈন-ই ত্বাইয়্যেবাঈনে নজদীদের বাদশাহী চলছে; কিন্তু এখনো ওখানে বিশ্ রাক্'আত তারাভীহ্ পড়া হয়। কারো ইচ্ছা হলে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসতে পারেন। জানিনা, আমাদের এখানকার ওহাবী লা-মাযহাবীরা কার অনুসরণ করে, যারা আট রাক্'আত তারাভীহ্ পড়ে। আট রাক্'আত তারাভীহ্ তো সুন্নাতে রসূলের বিরোধী, সুন্নাতে সাহাবার পরিপন্থী, মুসলমানদের সুন্নাতের বরখেলাফ। ওলামা- মুজতাহিদীনের বিপরীত; এমনকি ওটা হারামাঈন-ই ত্বাইয়্যেবাইনেরও বিরোধী; অবশ্য মনের কুপ্রবৃত্তির অনুরূপ। কারণ, নামায নাফসে আম্মারার উপর বোঝা স্বরূপ। মহান রব নাফসে আম্মারার ফাঁদগুলো থেকে মুক্ত করে সুন্নাতে রসূলের উপর আমল করার তাওফীক দিন। আ-মী-ন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ বিশ্ রাক্'আত তারাভীহর বিপক্ষে আপত্তিসমূহ ও সেগুলোরখণ্ডন বাস্তব কথা হচ্ছে- লা-মাযহাবী আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের নিকট আট রাক্'আত তারাভীহর পক্ষে কোন মজবুত দলীল নেই; আছে কিছু অহেতুক ভ্রম আর কিছু অমূলক সন্দেহ। ইচ্ছে হচ্ছে না ওইগুলো খণ্ডন করতে, কিন্তু বিষয়টির আলোচনা পূর্ণাঙ্গ করার জন্য তাদের আপত্তিগুলো ও সেগুলোর খন্ডন আরয করার প্রয়াস পাচ্ছি। মহামহিম রব তাদেরকে হিদায়ত নসীব করুন!

আপত্তি-১.

ইমাম মালিক সা-ইব ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণনা করেছেন-

انّه قَالَ امَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيْمَ الدَّارِىَّ اَنْ يَقُوْمَا لِلنَّاسِ بِاِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً ...الخ

অর্থ: তিনি বলেন, হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উবাই ইবনে কা'ব ও তামীমে দারীকে নির্দেশ দিলেন যেন তাঁরা লোকদেরকে এগার রাক্'আত নামায পড়িয়ে দেন।...

এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে, হযরত ফারূক্ব-ই আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আট রাক্'আত তারাভীহ্ পড়ানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদি তারাভীহ্ বিশ রাক্'আত হতো তাহলে বিতরসহ সর্বমোট২৩ রাক্'আত হতো।

খন্ডন এর কয়েকটা জবাব দেওয়া যায়- এক. এ হাদীস, হে আহলে হাদীস, তোমাদেরও ঘোর বিরোধী। কেননা, এ থেকে যেখানে আট রাক্'আত তারাভীহ্ প্রমাণিত হলো বলে তোমরা দাবী করছো, ওখানে তিন রাক্'আত বিত্র নামাযের প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে। তখনই তো সর্বমোট এগার রাক্আত হবে, আট রাক্'আত ও তিন রাক্'আত বিতর। যদি বিতর নামায এক রাক্'আত হতো, তবে সর্বমোট নয় রাক্আত হয়, এগার রাক্'আত হয় না। বলো, তোমরা এক রাক্'আত বিত্র কেন পড়ো? তোমরা এক হাদীসের একাংশ মেনে নিচ্ছো, আরেকাংশকে অস্বীকার করছো? সুতরাং এ রেওয়াতের তোমরা যে জবাব দেবে ওই জবাব আমাদেরও হবে।

দুই. এ হাদীসের রাভী (বর্ণনাকারী) মুহাম্মদ ইবনে ইয়ূসুফ। তার বর্ণনাদিতে তুমুল গড়মিল ও ভিন্নতা রয়েছে। মুআত্তা-ই ইমাম মালিকে এ বর্ণনায় তো তাঁর নিকট এগার রাক্'আতের উদ্ধৃতি রয়েছে, আর মুহাম্মদ ইবনে নাসর মারভেযী তার নিকট থেকে তের রাক্'আত বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিস আবদুর রায্যাক্ব তাঁরই থেকে একুশ রাক্'আত বর্ণনা করেছেন। দেখুন ফাৎহুল বিহারী শরহে বোখারী: ৪র্থ খণ্ড: পৃ. ১৮, খায়রিয়া প্রেস, মিশর থেকে মুদ্রিত। সুতরাং তার কোন বর্ণনাই নির্ভরযোগ্য নয়। আশ্চর্য! তোমরা কি নাফসে আম্মারার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য এমন সব অনির্ভরযোগ্য বর্ণনারআশ্রয় নিচ্ছো?

তিন. হযরত ওমর ফারূক্বের যুগে প্রাথমিক পর্যায়ে আট রাক্'আত তারাভীহর হুকুম দেওয়া হয়েছিলো। তারপর বার রাক্'আতের, সর্বশেষ বিশ রাক্আতের নির্দেশ দেওয়া হয়। এটা সব সময়ের জন্য বহাল হলো। সুতরাং এ-ই 'মুআত্তা-ই ইমাম মালিক'-এ হযরত আ'রাজ থেকে এক দীর্ঘ হাদীস শরীফ বর্ণনা করেনযার সর্বশেষ শব্দাবলী নিম্নরূপ:

وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِيْ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فَإِذَا اقَامَهَا فِيْ اِثْنَىْ عَشَرَةَ رَكْعَةً رَاَى النَّاسُ انَّه□ قَدْ خُفِّفَ

অর্থঃ ক্বারী আট রাক্'আত তারাভীহতে সূরা বাক্বারা পড়তেন। অতঃপর যখন বার রাক্'আতে তা পড়তে লাগলেন, তখন লোকেরা অনুভব করলো যে, তাদের উপর সহজ করা হয়েছে।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মাওলানা আলী ক্বারী তাঁর 'মিরক্বাত শরহে মিশকাত'-এ বলেন-

ثَبَتَ الْعِشْرُوْنَ فِيْ زَمَنِ عُمَرَ وَفِى الْمُوَطَّا رِوَايَةً بِاِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً وَجُمِعَ بَيْنَهُمَا انَّه□ وَقَعَ اَوَّلاً ثُمَّ اسْتَقَرَّ الْاَمْرُ عَلَى الْعِشْرِيْنَ فَاِنَّه□ الْمُتَوَارَثُ

অর্থঃ অবশ্য বিশ্ রাক্'আতের হুকুম হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর যামানায় প্রমাণিত ও সাব্যস্ত হয়েছে। মু'আত্তা শরীফে এগার রাক্'আতের উল্লেখ রয়েছে। এ দু'টি বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য এভাবে করা হয়েছে যে, হযরত ওমর ফারূক্বের খিলাফতকালে প্রথমে আট রাক্'আতের হুকুম ছিলো। তারপর বিশ রাক্'আত তারাভীহর উপর স্থির হলো। এটাই মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হলো।

বুঝা গেলো যে, আট রাক্'আত তারাভীহর উপর আমল বর্জন করা হয়েছে। বিশ রাক্'আত তারাভীহ্ সাহাবা-ই কেরাম ও সমস্ত মুসলমানের মধ্যে কার্যকর রয়েছে।

আপত্তি-২

হে আহলে সুন্নাত! আপনাদের পেশকৃত হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হলো যে, হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিশ রাক্'আত তারাভীহ্ পড়তেন। সুতরাং হযরত ওমর প্রথমে আট রাক্'আতের হুকুমই বা কেন দিলেন? সুন্নাতের পরিপন্থী হুকুম দেওয়া সাহাবা-ই কেরামের শান থেকে বহু দূরে। (অর্থাৎ অসম্ভবই।)

খন্ডন

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজে তো বিশ রাক্'আত তারাভীহ্ পড়েছেন। কিন্তু সাহাবীদেরকে এ সংখ্যার স্পষ্ট নির্দেশ দেননি। শুধু রমযানের রাতগুলোতে বিশেষ নামাযের প্রতি উৎসাহ্ দিয়েছেন; বরং খোদ্ জমা'আতসহকারে, নিয়মানুসারে, সবসময় করাননি। এর কারণ এটা বর্ণনা করেছেন যে তারাভীহ্ ফরয হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। এ জন্য সাহাবা-ই কেরামের সামনে তারাভীহর রাক্'আতগুলোর সংখ্যা প্রকাশ পায়নি।

হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রাথমিক পর্যায়ে নিজের ইজতিহাদ দ্বারা আট রাক্'আত, বার রাক্'আত নির্দ্ধারণ করেছেন। বিশ রাক্'আতের সূত্র পাওয়া মাত্রই বিশ রাক্'আতেরই স্থায়ী হুকুম দিয়ে দিয়েছিলেন। ওই যুগে আজকালের মতো হাদীস শরীফগুলো কিতাবগুলোতে সংকলন করা হয়নি। একেকটা হাদীস অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম করে অর্জন করা যেতো।

আপত্তি-৩.

বোখারী শরীফে আছে- হযরত আবূ সালমাহ্ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিক্বাহকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রমযানের রাতগুলোতে কত রাক্'আত পড়তেন। তখন উম্মুল মু'মিনীন বললেন-

مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلاَ فِيْ غَيْرِه□ عَلٰى اِحْدٰى عَشَرَ رَكْعَاتٍ

অর্থঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রমযান ও গর রমযানে এগার রাক্'আতের বেশি পড়তেন না।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেলো যে, হুযূর-ই আক্রাম তারাভীহ্ আট রাক্'আত পড়তেন। যদি বিশ রাক্'আত পড়তেন, তাহলে ২৩ রাক্'আতহয়ে যেতো।

খন্ডন এ আপত্তির ও কয়েকটা জবাব দেওয়া যায়- এক. এ হাদীস আপত্তিকারীদেরও বিপরীত। কারণ, যদি এটা থেকে আট রাক্'আত তারাভীহ্ প্রমাণিত হয়, তাহলে তিন রাক 'আত বিতরও প্রমাণিত হয়। তখনই তো সর্বমোট এগার রাক্'আত হয়। আপনারা বিতর এক রাক্'আত পড়েন কেন জবাব দিন। আপনারা কী হাদীসের একাংশের উপর ঈমান রাখছেন, আর বাকী অংশকে অস্বীকার করছেন?

দুই. হযরত উম্মুল মু'মিনীন এখানে তাহাজ্জুদের নামাযের কথা উল্লেখ করেছেন, তারাভীহর নামাযের নয়। এ কারণে তিনি এরশাদ করেছেন, রমযান ও গর রমযানে, অন্যান্য মাসে এগার রাক্'আতের বেশি পড়তেন না। রমযান ছাড়া গর রমযানে কোন্ মাসে তারাবীহ্ পড়া হয়? যদি আপনারা একথায় গভীরভাবে চিন্তা করে নিতেন, তাহলে এ আপত্তির দুঃসাহস করতেন না। এ কারণে তিরমিযী শরীফে এ হাদীসকে, 'রাতের নামায, অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামাযের বিবরণ শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া, এ হাদীসেরই শেষভাগে আছে হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি বিতরের পূর্বে কেন শুয়ে পড়েন? তিনি এর জবাবে বলেন, 'হে আয়েশা, আমার চোখ দু'টি ঘুমায়, হৃদয় ঘুমায় না। এ থেকে বুঝা গেলো যে, এ নামায হুযূর-ই আক্রাম শেষ রাতে ঘুম থেকে ওঠে সম্পন্ন করতেন। তারাভীহ্ শয়ন করার পর পড়া হয় না, তাহাজ্জুদ পড়া হয়।

তিন. যদি এ নামায মানে তারাভীহর নামায হয়, আর হুযূর-ই আক্রাম আট রাক্'আত তারাভীহ্ পড়তেন, তাহলে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিশ রাক'আত তারাভীহর হুকুম কেন দিলেন? আর সমস্ত সাহাবীও কোন এ হুকুম মেনে নিলেন? হযরত উম্মুল মু'মিনীনও এসব কিছু দেখে কেন ঘোষণা করলেন না যে, 'আমি হুযূর-ই আন্ওয়ারকে আট রাক্'আত তারাভীহ্ পড়তে দেখেছি, তোমরা কেন বিশ্ রাক্'আত পড়ছো? এটা তো সুন্নাতের পরিপন্থী, বিদ'আতে সাইয়্যেহ্!' তিনি কেন নিশ্চুপ রইলেন? একটু হুঁশে আসুন, হাদীস শরীফের সঠিক অর্থ বুঝার ছেষ্টা করুন।ওহাবী-লা মাযহাবীদের প্রতি কতিপয় প্রশ্ন সমগ্র দুনিয়ার ওহাবীদের প্রতি নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করা হলো, সবাই মিলে সেগুলোর জবাব দিন! বলোতো।

এক. হযরত ওমর, ওসমান ও আলী রাদ্বিয়াল্লা তা'আলা আনহুম বিশ্ রাক্'আত পড়ার হুকুম কেন দিলেন? তাঁদের কি এ সুন্নাতের খবর ছিলোনা? আজ চৌদ্দ শতাধিক বছর পর আপনারা জানতে পারলেন?

দুই. যদি না'উযুবিল্লাহ্, খোলাফা-ই রাশেদীন বিদ'আত-ই সাইয়্যেহ্র নির্দেশদেন, তাহলে সমস্ত সাহাবী বিনা প্রতিবাদে কেন তা কবূল করে নিলেন? তাঁদের মধ্যে কি কেউ সত্য কথা বলার ও সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন না? আজ এতকাল পর আপনারা সত্যবাদী পয়দা হয়ে গেলেন এবং সুন্নাতের অনুসারীও?

তিন. যদি সমস্ত সাহাবীও নিশ্চুপ থাকেন, তবে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা একটা সুন্নাতে রসূলের বিপরীত বিদ'আত-ই সাইয়্যেহ্র প্রচলন হতে দেখে তিনি কেন নিশ্চুপ রইলেন? তাঁর উপর সত্যের প্রচার ফরয ছিলো কিনা? যেমন আপনারা আজকাল আট রাক'আত তারাভীহর জন্য ওঠে পড়ে লেগেছেন, মৌখিক, আন্তরিক, দৈহিক ও আর্থিকভাবে জোর দিচ্ছেন, তিনি তেমনটি করলেন না কেন? তাহলে তো আপনারা হযরত উম্মুল মু'মিনীন থেকেও উত্তম হয়ে গেলেন?

চার. হে লা-মাযহাবী-ওহাবীরা বলুন, ওইসব খোলাফা-ই রাশেদীন এবং সমস্ত সাহাবী, বরং খোদ উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দিক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা ওয়া আনহুম বিশ রাক'আত তারাভীহ্ পড়ে, পড়িয়ে কিংবা জারী হতে দেখে নিশ্চুপ র'য়ে কি হিদায়তের উপর ছিলেন, নাকি, না'উযুবিল্লাহ্, পথভ্রষ্টতার উপর ছিলেন? যদি আজ হানাফীগণ বিশ রাক্'আত তারাভীহ্ পড়ার ভিত্তিতে গোমরাহী ও বিদ'আতী হন, তাহলে ওইসব হযরতের উপর আপনাদের ফাৎওয়া কি?জবাব দিন!

পাঁচ. যদি বিশ রাক্'আত তারাভীহ্ বিদ'আতে সাইয়্যেহ্ হয়, আর আট রাক'আত তারাভীহ্ হয় সুন্নাত এবং আপনারা বাহাদুরগণ আজ চৌদ্দশতাধিক কাল পরে এসে এ সুন্নাত জারী করে থাকেন, তাহলে বলুন, হেরমাঈন তাইয়্যেবাঈনের সমস্ত মুসলমান, আপনাদের ফাৎওয়া অনুসারে বিদ'আতী ও গোমরাহ্ কিনা? আর যদি না হয় তবে কেন? যদি হন, তাহলে আপনারা আজ নজদী ওহাবীদেরকে এর তাবলীগ কেন করছেন না? আপনাদের ফাৎওয়া কি শুধু পাক-বাংলা-ভারতে ফ্যাসাদ ছড়ানোর জন্যই।

ছয়. সম্মানিত মুজতাহিদ ইমামগণ এবং তাদের সমস্ত অনুসারী, যাঁদের মধ্যে লাখো আউলিয়া, ওলামা, মুহাদ্দিস-ফোক্বাহ, মুফাসিসরীন রয়েছেন, যাঁরা সবাই

বিশ্ রাক্'আত তারাভীহ্ পড়তেন, তাঁরা কি সবাই বিদ্'আতী ও গোমরাহ্ ছিলেন?

সাত. যদি এসব হযরত গোমরাহ হন, আর হিদায়তের উপর আপনাদের মুষ্ঠি পরিমাণ দলই থাকে, তাহলে ওই সব পথভ্রষ্টের কিতাবাদি থেকে হাদীস নেওয়া, হাদীস পড়া জায়েয, না কি হারাম, আর তাঁদের বর্ণিত হাদীস সহীহ্ কিনা? যখন মন্দ আমল-বিশিষ্ট লোকের বর্ণিত হাদীস সহীহ্ হয় না, তবে মন্দ আক্বীদা সম্পন্নের হাদীস সহীহ্ কিভাবে হতে পারে?

আট. দুনিয়ার মুসলমান, যাঁরা বিশ রাক্'আত তারাভীহ্ পড়েন, আপনাদের ফাৎওয়া অনুসারে গোমরাহ্ ও বিদ্'আতী কিনা? যদি তেমনি হয়, তাহলে এ হাদীসের মর্মার্থকি? اِتَّبِعُوْا السَّوَادَ الْاَعْظَمَ অর্থাৎ মুসলমানদের বড় দলের অনুসরণ করো! আর কোরআন-ই করীমে তো আম মুসলমানদেরকে 'শ্রেষ্ঠতম উম্মত' ও মানুষের উপর আল্লাহর সাক্ষী এটা বলেছেন কেন?

আশা করি, লা-মাযহাবী, ওহাবী সম্প্রদায় তাদের নজদ পর্যন্ত অঞ্চলের ওহাবী-আলিমদের সাথে মিলে এসব প্রশ্নের জবাব দেবেন! আমরা অপেক্ষায় রইলাম।

আমাদের দাবী!

সমগ্র দুনিয়ার ওহাবী-নজদী-লা মাযহাবীদের নিকট আমরা এটা চাই যে, তারা যেন একটি মাত্র সহীহ্, মরফূ' হাদীস, বোখারী, মুসলিম অথবা কমপক্ষে সেহাহ্ সিত্তাহর এমনই হাদীস পেশ করুক, যাতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আট রাক্'আত তারাভীহ্ পড়তেন কিংবা সেটার নির্দেশ দিতেন কিন্তু 'তারাভীহ্' শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে অথবা সাহাবা-ই কেরাম আট রাক্'আত স্থায়ীভাবে পড়েছেন।আর আমরা বলে দিচ্ছি- ক্বিয়ামত পর্যন্ত দেখাতে পারবেন না আপনারা নিছক জেদের উপর রয়েছেন, আল্লাহ্ তা'আলা সত্য গ্রহণের তাওফীক্ব দিন। আ-মী-ন! বিশ্ রাক্'আত তারাভীহর প্রমাণ, আলহামদু লিল্লাহ্, হুযূর-ই আক্রামের আমল শরীফ, সাহাবা-ই কেরামের বাণী ও আমল (কর্ম), আম মুসলমানের আমল বা তরীক্বাহ্ এবং শরিয়তসম্মত ক্বিয়াস বা যুক্তি থেকে পাওয়া যায়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক।

মজার ঘটনা!

গায়র মুক্বাল্লিদ ওহাবী যখন কখনো হানাফীদের মধ্যে এসে আটকা পড়ে যায়, তবে তারাভীহ্ বিশ রাক্'আত পড়ে নেয়। এটা অনেকবার দেখা গেছে ও যাচ্ছে। বুঝা গেলো যে, তাদের নিজেদের মাযহাবের উপরও পূর্ণ বিশ্বাস নেই।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নারায়ে তাকবীর — আল্লাহু আকবার
নারায়ে রিসালাত — ইয়া রাসূলাল্লাহ (দ:)

খানকা-এ-জলিলিয়া

"মা নীড়" ১৩২/৩ আহমদবাগ,
রোড নং-২, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪
ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

খানকা-এ-জলিলিয়ায় প্রতি ইংরেজী মাসের ২য় বৃহস্পতিবার বাদ এশা হালকায়ে যিকির ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সকল পীরভাই, হুজুরের ভক্তবৃন্দ ও অনুসারী খানকায় উপস্থিত হয়ে এবাদত-বন্দেগী ও হুজুরের রূহানী ফয়েজ লাভ করে আখেরাতের অশেষ নেকী হাসিল করুন।

বি.দ্র. : রমজানে সুন্না তারাবির বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

সালামান্তে
মোহাম্মদ আবদুর রব ও হুজুরের ভক্তবৃন্দ

রমজানুল মুবারক

ইমরান বিন বদরী

নাহমাদুহু ওয়া নুসল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম,আম্মা বা'দ।সমস্ত প্রশংসা পরম করুণাময় রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তায়ালার জন্য; আর সালাত (দুরূদ) ও সালাম আমাদের নবী সায়্যাদুল মুরসালীন প্রিয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি।

রমজান মাস যে মাস পবিত্র কুরআন নাজিলের মাস,যে মাস গুনাহ মাফের মাস,যে মাস দুয়া কবুল করার মাস,যে মাস আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাস। যে মাস প্রতি বছর আসে পাপ-পঙ্কিলতায় জর্জরিত মানব জাতিকে সীমাহীন রহমতের ছায়ায় চির শান্তির আবাস জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিতে। যে মাস আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রহমত ও বরকতের প্লাবনের মাস। যে মাস মাগফিরাতের মাস। আরো রয়েছে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য মহান আল্লাহর রমতের উপহারের রজনী যাকে লাইলাতুল ক্বদর বলা হয়।যে রাতে কুরআনুল কারিম নাযিল হয়েছিল।আল্লাহ পাক বলেন-

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

লাইলাতুল কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (সূরা কদর ৩)

◉ হজরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যাক্তি লাইলাতুল ক্বাদরে ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদাত করে, তাঁর পিছনের সমস্ত গুনাহ মাপ করা হবে। আর যে ব্যাক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রমযানে সিয়াম পালন করবে, তাঁরও অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে। (সহীহ বুখারি) পরম করুণাময় রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তায়ালা এমন কোন বিধান মানুষের উপর চাপিয়ে দেননি যা মানুষের সাধ্যের বাহিরে। মানুষের উপযোগী করেই ইসলামের প্রতিটি বিধান তৈরী করা হয়েছে, যা পালন করা তেমন কষ্টকর বিষয় নয়। মহব্বত ও আন্তরিকতা থাকলেই অনায়াসে সমস্ড় আদেশ পালন করা যায়। স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে আল্লাহ পাক ইসলামের বিধান পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও সংযোজন-বিয়োজন করে ইসলামকে সময়োপযোগী পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন।

❖ রমজান (رَمَضَان) আরবি শব্দ 'রমজ' ধাতু থেকে এসেছে। 'রমজ' ধাতুর দুটি অর্থ আরবি অভিধান ও আরবি সাহিত্যে পাওয়া যায়। এর একটি অর্থ হলো দাহন বা পোড়ানো এবং অপরটি আরব দেশের বছরের প্রথম বৃষ্টি। অন্যদিকে সওম একটি আরবী শব্দ যার অর্থ বিরত থাকা বা আত্মসংযম করা। এটি আরবী সিয়াম শব্দের সমার্থক। এ মাসের নাম রমজান এজন্য রাখা হয়েছে যে সর্বপ্রথম যখন এ মাসের নাম রাখা হয়েছিল তখন প্রচণ্ড গরম ছিল।এজন্য এই মাসের নাম রাখা হয়েছে রমজান।এই পবিত্র মাসকে রমজান এ জন্য বলা হয়, এ মাসে আল্লাহপাক নিজ মেহেরবানিতে সব গুনাহ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেন; মানুষ যেন এক নব জীবন লাভ করতে পারে।শরীয়তের দৃষ্টিতে রমজান মাসে দিনের বেলা রোজা রাখার ফলে সারাদিন সকল প্রকার পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকার কারণে মানুষের শরীরে এক প্রকার দাহ ও জ্বলনের সৃষ্টি হয়। সে গাত্রদাহ ও অন্তর্দাহকে সম্বল করে মহান আল্লাহ পাক বান্দার পিছনের পাপ রাশি তার গাত্রদাহের আগুনে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেন, ক্ষমা করে দেন। এ হচ্ছে রমজান মাসকে নামকরণের স্বার্থকতা।রমযান (رمضان / Ramaḍan) হল ইসলামিক বর্ষপঞ্জিকা অনুসারে নবম মাস।যে মাসে বিশ্বব্যাপী মুসলিমগণ ইসলামিক উপবাস সওম পালন করে থাকে। রমজান মাসে রোজাপালন ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে তৃতীয়তম। রমজান মাস চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে ২৯ অথবা ত্রিশ দিনে হয়ে থাকে যা নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারাপ্রমাণিত। হিজরী দ্বিতীয় সনের শাবান মাসের মাঝামাঝি সময়ে কেবলা পরিবর্তন হওয়ার দশ দিন পর পবিত্র রমজান মাসের রোজা ফরজ করা হয়েছে। এ মাসে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম ব্যক্তির উপর সওম পালন ফরয, কিন্তু অসুস্থ,গর্ভবতীঋতুবর্তী নারীদের ক্ষেত্রে তা শিথিল করা হয়েছে। রোজা বা সাওম হল সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার,পঞ্চইন্দ্রিয়ের দ্বারা গুনাহের কাজ এবং (স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে) যৌনসংগম থেকে বিরত থাকা। এ

মাসে বিশ্বমুসলিমগণ অধিক ইবাদত করে থাকেন। কারণ অন্য মাসের তুলনায় এ মাসে ইবাদতের সওয়াব বহুগুণে বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

◉ রমজান,রোজা বা সওম প্রসংগে মহান আল্লাহপাক বলেন –

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (সূরা বাক্বারাহ ১৮৫)

◉ মহান আল্লাহপাক রোজা ফরয করা প্রসংগে আরো ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার। (সূরা বাক্বারাহ ১৮৩)

❖ হাদিস শরীফে আল্লার প্রিয় হাবীব ইরশাদ করেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা যখন চাঁদ দেখবে তখন সওম আরম্ভ করবে এবং যখন চাঁদ দেখবে তখন ইফতার করবে। তবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ত্রিশ রোযা পূর্ণ করবে।

ইমাম ইসমাইল বুখারী (রঃ)উনার বিখ্যাত সহীহ বুখারীতে এই হাদিস শরীফটি উল্লেখ করেছেন।

◉ এছাড়াও ইসলামের ৫টি ভিত্তির মধ্যে ১টির অন্তর্ভুক্ত সওম/রোযা :-

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

হজরত উবায়দুল্লাহ্ ইবনু মূসা (রাঃ) ইবনু উমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি।

১। আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ্ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল-এ কথার সাক্ষ্য দান।

২। সালাত (নামাজ) কায়েম করা

৩। যাকাত দেওয়া

৪। হাজ্জ (হজ্জ) করা এবং

৫। রামাদান এর সিয়াম পালন করা। (সহীহ বুখারি/ঈমান)

◉ হজরত তালহা ইবনে উবাদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত যে

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرُ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ، وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم " خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ". فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ " لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ ". قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "

www.sunnibarta.com

وَصِيَامُ رَمَضَانَ ". قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ قَالَ " لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ ". قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ. قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ " لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ ". قَالَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ"

এলোমেলো চুলসহ একজন গ্রাম্য আরব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট এলেন। তারপর বললেন, ইয়া রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে বলুন, আল্লাহ তা'আলা আমার উপর কত সালাত ফরজ করেছেন?

তিনি বলেনঃ পাঁচ (ওয়াক্ত) সালাত, তবে তুমি যদি কিছু নফল আদায় কর তা স্বতন্ত্র কথা। এরপর তিনি বললেন, বলুন, আমার উপর কত সিয়াম আল্লাহ তা'আলা ফরজ করেছেন? রাসূল صلى الله عليه و آله و سلم বললেনঃ রমযান মাসের সওম, তবে তুমি যদি কিছু নফল কর তবে তা স্বতন্ত্র কথা। এরপর তিনি বললেন, বলুন, আল্লাহ আমার উপর কি পরিমান যাকাত ফরয করেছেন? রাবী বলেন, রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইসলামের বিধান জানিয়ে দিলেন।এরপর তিনি বললেন, ঐ সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে সম্মানিত করেছেন, আল্লাহ আমার উপর যা ফরয করেছেন, আমি এর মাঝে কিছু বাড়াব না এবং কমাবও না।রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ সেও সত্য বলে থাকলে সফলতা লাভ করল কিংবা বলেছেন, সে সত্য বলে থাকলে জান্নাত লাভ করল।ইমাম বুখারী (রঃ)উনার বিখ্যাত সহীহ বুখারীতে এই মূল্যবান হাদিস শরীফটি উল্লেখ করেছেন।

⊙ হজরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রমযান আরম্ভ হলে রহমতের দরাজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে শিকলে আবদ্ধ করা হয়। (সহীহ মুসলিম)

⊙ হজরত সাহল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ জান্নাতে রায়্যান নামক একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন সওম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাঁদের ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেওয়া হবে, সাওম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তাঁরা ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাঁদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যাতে এ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে। (সহীহ বুখারি)

⊙ হজরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- সিয়াম ঢাল স্বরূপ। সুতরাং অশ্লীলতা করবে না এবং মূর্খের মত কাজ করবে না। যদি কেউ তাঁর সাথেঝগড়া করতে চায়, তাঁকে গালি দেয়, তবে সে যেন দুই বার বলে, আমি সাওম পালন করছি। ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রানে, অবশ্যই সওম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকের গন্ধের চাইতেও উৎকৃষ্ট, সে আমার জন্য আহার,পান ও কামাচার পরিত্যাগ করে। সিয়াম আমারই জন্য। তাই এর পুরষ্কার আমি নিজেই দান করব। আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশ গুন।

ইমাম ইসমাইল বুখারী (রঃ)উনার বিখ্যাত সহীহ বুখারীতে এই মূল্যবান হাদিস শরীফটি উল্লেখ করেছেন।

❖ রোজার উদ্দেশ্য : ১.আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সহায়ক। রোযা ইবাদতের সুযোগ ও তাকওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করে। ২. রোযা ধৈয্য ও সংযম শেখায়। আত্ম নিয়ন্ত্রন শক্তির উন্নয়ন ঘটায়। ৩. অন্যের সম্পদ বা অধিকার হরণ থেকে বিরত রাখা।এভাবেই তাকওয়া ও আনুগত্যের অনুশীলন হয়ে যায়। ৪. রিয়ামুক্ত ইবাদত করার প্রশিক্ষণ দেয়। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, রোযাদার বান্দা আমার জন্যই খাদ্য-পাণীয় ও প্রবৃত্তি বর্জন করেছে। রোজা আমারই জন্য। আমিই এর প্রতিদান দেব বা আমি নিজেই এর প্রতিদান।

❖ বিনা ওজরে রোজা না রাখার পরিণাম হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নবী করিম صلى الله عليه و آله و سلم বলেছেন যে ব্যক্তি বিনা ওজরে ইচ্ছাপূর্বক রমজানের একটি রোজা ভঙ্গ করেছে, অন্য সময়ের সারা জীবনের রোজা তার সমকক্ষ হবে না।

❖ যাদের ওপর রোজা রাখা ফরজ - প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ, মুসাফির নয় এমন সব মুসলমানের ওপর মাহে রমজানের রোজা পালন করা ফরজ।

www.sunnibarta.com

❖ রোজা সহিহ হওয়ার শর্ত হচ্ছে - **নিয়ত করা **মহিলাদের হায়েজ ও নিফাস থেকে মুক্ত হওয়া **রোজা বিনষ্টকারী বিষয়াদি থেকে দূরে থাকা। **সেহরি খাওয়া,শেষরাতে সুবহে সাদিকের আগে রোজা রাখার নিয়তে যে খাবার খাওয়া হয় তাকে সেহরি বলে। সেহরি খাওয়া সুন্নত। নবী করিম (সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসালাম) বলেছেন, তোমরা সেহরি খাও। কেননা সেহরিতে বরকত রয়েছে। ***ইফতার করা,পূর্ণ দিবস রোজা পালনের পর সূর্যাস্তের পরপর আহার গ্রহণের মাধ্যমে রোজার যে পরিসমাপ্তি করা হয় তাকে ইফতার বলে। খেজুর দ্বারা ইফতার করা সুন্নত। সূর্যাস্তের পর বিলম্ব না করেইফতার করা সুন্নত।

❖ যেসব কারণে রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ এবং কাজা আদায় করতে হয় -

১. অসুস্থতার কারণে রোজা রাখার শক্তি না থাকলে কিংবা রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকলে অথবা সুস্থতা লাভে বিলম্বিত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ।

২. অন্তঃসত্ত্বা নারী ও স্তন্যদানকারিণী নারী যদি রোজা রাখেন, তাহলে তাঁর কিংবা তাঁর সন্তানের প্রাণনাশের অথবা অসুস্থ হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকলে তাঁর জন্য রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ।

৩. মুসাফিরের রোজা না রাখা কিংবা ভঙ্গ করার অনুমতি আছে।

❖ যেসব কারণে রোজা নষ্ট হয় এবং কাজা ও কাফফরা ওয়াজিব হয় -

১. স্বেচ্ছায় সঙ্গম করা।
২. স্বেচ্ছায় পানাহার করা, তা কোনো খাবার হোক অথবা কোনো ওষুধ হোক।
৩. স্বেচ্ছায় বৃষ্টির ফোঁটা মুখের ভেতর পড়ার পর তা গিলে ফেলা।
৪. স্বেচ্ছায় ধূমপান করা।

❖ যেসব কারণে রোজা নষ্ট হয় এবং শুধু কাজা ওয়াজিব হয়-

১. কোনো দৈহিক ওজরের কারণে পানাহার করা। তেমনিভাবে ভুলক্রমে পানাহার করার পর রোজা নষ্ট হয়েছে মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কিছু পানাহার করা।
২. নাক ও কানের ভেতর ওষুধ ব্যবহার করা।
৩. মলদ্বার দিয়ে ওষুধ প্রবেশ করানো।
৪. খাদ্যদ্রব্য নয় এমন কিছু, যেমন খেজুরের আঁটি, তুলা, কাগজ, লোহা, কংকর, মাটি অথবা এর টুকরা ইত্যাদি গিলে ফেলা।
৫. কুলি করার সময় পানি গলার ভেতরে চলে যাওয়া।
৬. কানের ভেতর তেলের ফোঁটা কিংবা পানির ফোঁটা দেওয়া।
৮. রাত শেষ হয়নি মনে করে সুবহে সাদিক হওয়ার পর কোনো কিছু আহার করা অথবা স্ত্রী সহবাস করা।
৯. দাঁতের মধ্য থেকে ছোলা পরিমাণ কিছু বের করে খাওয়া।

* রোজা রেখে ইনহেলার ব্যবহার করলে রোজা ভেঙে যাবে। কারণ, ইনহেলার দ্বারা অ্যাজমা বা হাঁপানি রোগী শ্বাসকষ্ট দূর করার জন্য মুখ দিয়ে ধোঁয়া টেনে নেয়- যেভাবে মানুষ বিড়ি-সিগারেট পান করে। রোজা অবস্থায় বিড়ি-সিগারেট পান করা নিষেধ। এতে রোজা ভেঙে যায়। তাই ইনহেলার ব্যবহারেও রোজা ভেঙে যায়।

* রোজা অবস্থায় যদি কোনো স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব হয় তাহলে রোজা ভেঙে যাবে। যতগুলো রোজা বাদ যাবে বছরের অন্য সময়ে তা কাজা আদায় করে নেবে। সন্তান প্রসব করলেও একই বিধান।

* যদি কোনো ব্যক্তি সেহরি খাওয়ার পর জানতে পারল যে, যেই সময়ে সেহরি খেয়েছে এর আগেই সময় শেষ হয়ে গেছে। অথবা সূর্যাস্ত হয়ে গেছেভেবে ইফতার করল। অতঃপর দেখা গেল এখনো সূর্যাস্ত হয়নি। তাহলে সেদিনের অবশিষ্ট সময়টুকু বিরতি পালন করবে এবং অন্য সময়ে তা কাজা আদায় করে নেবে।

❖ যেসব কারণে রোজা মাকরুহ হয় -

১. অপ্রয়োজনে কোনো জিনিসের স্বাদ আস্বাদন করা কিংবা চিবানো।
২. পরনিন্দা করা।
৩. ঝগড়া-ফ্যাসাদকরা।
৪. পূর্ণ দিবসাপাক অবস্থায় থাকা।
৫. টুথপেস্ট, মাজন কিংবা কয়লা দিয়ে দাঁত মাজা।
৬. মুখে থুথু জমিয়ে রেখে গিলে ফেলা।

আসুন আমাদের সামর্থের সকল প্রচেষ্টা দিয়ে রমযানের ইবাদতে ব্রতী হই।

হে আল্লাহ! আমাদের সবাইকে রমজান মাসে সিয়াম পালন করার তৌফিক দান কর।

(আমার লেখাতে ভুল হতে পারে।তাই মনের অজান্তে জ্ঞানের স্বল্পতায় ভুল হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে।

মাহে রমাদ্বান, হাফিজুল কোরআন ও সালাতুত তারাবী

মুহাম্মদ মুহিব্বুল-াহ সিদ্দিকী

মহান আল-াহ তা'আলা ফরমান, "নিশ্চয়ই আমি এ কোরআনকে নাযিল করেছি এবং আমি এর সংরক্ষণকারী"(আল-কোরআন ১৫:৯)।

আল-াহ তা'আলা আরো বলেন, "নিশ্চয়ই আমি কোরআনকে কদরের রাত্রিতে নাজিল করেছি" (আল-কোরআন ৯৭:১)।

হাদিস শরীফে রয়েছে, হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল-াহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে¨ সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কোরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়"। হাদিসে আরো এসেছে, হযরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম এরশাদকরেন, "যে ব্যক্তি কোরআনের একটি অক্ষর পাঠ করবে তার জন¨ বিপরীতে দশটি নেকী রয়েছে, আমি বলছি না আলিফ-লাম-মীম একটি অক্ষর বরং আলিফ একটি, লাম একটি এবং মীম একটি অক্ষর"।

উপরোক্ত আয়াতে কারীমা এবং হাদিসে পাকে মহা পবিত্র কোরআন এর ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। আল-াহ তা'আলা স্বয়ং কোরআন নাজিল করেছেন, এবং তিনিই এর সংরক্ষণ ব্যবস্থা করবেন। আর এ কোরআন মুখস্থকারী। কারণে অনেক সম্মানিত ও মর্যাদার অধিকারী।জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া চট্টগ্রাম এর সম্মানিত আরবি প্রভাষক ও হযরত গরীবুল-াহ শাহ্ মাযার মসজিদের খতীব হাফিজ কবি মাওলানা আনিসুজ্জামান সাহেবের সাথে গত ৫-৬ বছর পূর্বে অনেক¸লো কথা হয়েছিল।

উনি যেহেতু 'হাফিজ' তাই উনার আলোচনায় 'মাহে রমাদ্বান ও হাফিজুল কোরআন ও সালাতুত তারাবী' নিয়েও অনেক কথা হয়। পবিত্র আল কোরআন মুসলমান নয়; বরং সকল মানুষের সংবিধান। আর কোরআন কালামুল-াহ তথা আল-াহ তা'আলার বাণী; যা নাজিল হয় রমাদ্বান মাসের ২৭ তারিখ। আর কোরআনকে যিনি মুখস্থ করেন তিনি হলেন 'হাফিজ'। সর্ব প্রথম হাফিজ আমার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম। সব মিলিয়ে মাহে রমাদ্বান ও হাফিজুল কোরআন ও সালাতে তারাবীর মধে একটি গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। একজন হাফিজুল কোরআন ১০জন জাহান্নামীকে সুপারিশ পূর্বক জান্নাতে নিয়ে যাবেন, যা হাদিস মারফত আমরা অবগত হই। কোরআন ব¨তি রেখে যদি অন¨ কোন ধর্ম গ্রন্থ মুখস্থকারী তলব করি, তাহলে পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ সমগ্র বলতে যা বুঝায় তা ছাকুনি দিয়ে খুঁজা হবে তবে 'মুখস্থকারী' আবিস্কার করা সম্ভব পর হবে না। প্রিয়নবী, ইসলাম ও কোরআন যে সত¨ ও শ্বাশত এখান থেকে ইশারা আমরা পাই। ইদানিং কালে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণ মুসলমান ভাইয়েরা পবিত্র কোরআন হিফজ করছেন। বাংলাদেশে ১০ হাজরের মত আলিয়া মাদরাসা রয়েছে। খারেজিয়া ৩০ হাজারের মত ; কিন্তু আজ অবধি কেউ হাফিজিয়া মাদরাসা গণনার কাজটি সম্পন্ন করতে পারেনি; তবে একটি গবেষণায় ১৮,১৮৮টি উলে-খ করা হয়েছে (গবেষণার ধারণাপত্র,পৃষ্ঠা- ১৩৪ ইসলামী ফাউ"েশন)। ইসলামের ভূমিকা সময় থেকেই সালাতুত তারাবী জামা'আতের সহিহ আদায় করতে লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফার"ক রাদ্বিয়াল-াহু আনহুর আমলে সালাতুত তারাবী জামা'আতের সহিহ আদায়ের পূর্ণ নিয়মে পরিণত হয়। সাহাবায়ে কিরামের কথা, কাজ সম্মতিও হাদিস, সে মর্মে তারাবির নামায ২০ রাকাআত জামা'আতের সাথে আদায় করা সুন্নাত।এখন শহর থেকে গ্রামের ইউনিয়ন, ওয়ার্ড, ইউনিট, ব-ক পর্যায়ে খতমে কোরআনের মাধ"মে রমাদ্বানের তারাবী আদায় করতে দেখা যায়। তবে খতমে তারাবী অনুষ্ঠিত মসজিদের সংখ¨া ১-২-৩-৪-৫ আর আমাদের হাফিজ সাহেব দেন সংখ¨া ১-২-৪-৮-১৬ হারে বাড়ছে। অর্থাৎ

www.sunnibarta.com

হাফিজ অনুযায়ী তারাবির মসজিদের সংখ্যা বাড়ছে না। খতমে তারাবী অনুষ্ঠিত মসজিদ এবং হাফিজে কোরআনদের সংখ্যা নিয়ে আলেম সমাজ চিন্তিত। তবে হাফিজদের সংখ্যা বৃদ্ধি সমাজের জন্য উপকার ও লাভজনক। বেশি ধান হলে রাখবো কোথায়? এ চিন্তায় যারা চিন্তাবিদ, তারা হাফিজদের বৃদ্ধিকে আর্শিবাদ মনে করবেন না। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, চট্টগ্রাম ও ঢাকাসহ বিশাল বিশাল প্রসিদ্ধ মসজিদে সেই ইংরেজ মান-দাদা আমলের ন্যায় ২ জন হাফিজ তারাবী পরিচালনা করা জন্য রাখা হয়। আর এ ২ জনকে উত্তম ভাবে আদর- কদর করে ২৭ রমাদ্বান রাত বার ঘটিকাস্তে ৫০-৬০ হাজার টাকা দিয়ে বিদায় করা হয়। অন্যদিকে অনেক হাফিজ মসজিদ না পেয়ে মন খারাপ করতঃ দিল থেকে কোরআন ছুটতে শুরু করেছে। কিছু কিছু হাফিজকে দেখা যায় এক রকম মোটা- বুন্দা হাদিয়া পাওয়ার কল্পে বড় বড় মসজিদে যায়; যা ওপেন সিক্রেট। যেহেতু রমাদ্বান মাসই হাফিজ সাহেবগণ পবিত্র কোরআন ইয়াদ তথা মুখস্থ রাখার অন্যতম মাধ্যম, সেজন্য আমাদেরকেও এ বিষয়ে আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। সে কল্পে নিম্নে 'মাহে রমাদ্বান ও হাফিজুল কোরআন ও সালাতুত তারাবী' সম্পর্কিত কিছু প্রস্তাবনা তুলে?

১. সরকার ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয় এর আওতাধীন ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে একটি পরীক্ষা কমিটি গঠন করবে,যা অনেকটা নিবন্ধনের ন্যায়। যেখানে প্রত্যেক হাফিজ পাস করলে তারাবী পড়ানোর অনুমতি পাবে। যেখানে তাজবিদ,শরীয়তের প্রাথমিক জ্ঞান, সুর,আচরন ইত্যাদি মূখ্য বিবেচ্য হবে।

২. খতমে তারাবী অনুষ্ঠিত হয় এমন সকল মসজিদে ২ জন হাফিজ রাখার পরিবর্তে ৪-৫ জন রাখবে। হাফিজ সাহেবগণ নামাযের পাশাপাশি মসজিদে শিশুদের, যুবকদের এবং মুরব্বিদেরকে কোরআন শিক্ষা, ইসলামী প্রাথমিক জ্ঞান, জিকির-আজকার, তালিমসহ প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে পারেন।

৩. প্রবাসী ও কর্মসংস্থান বিষয়ক মন্ত্রনালয় অবশ্যই যানেন যে, বাংলাদেশের হাফিজগণ আন্তর্জাতিক প্রায় সকল প্রতিযোগীতায় ভাল অব স্থানে থাকে এবং বাংলাদেশি হাফিজদের বিদেশে ভাল শুনাম রয়েছে। সেজন্য ইসলামী দেশসমূহে হাফিজ প্রেরণ বিষয়ে চিন্তা করা যায়। যারা বিদেশে দ্বীনি দাওয়াতী, মসজিদসহ ইসলামী খিদমত আনজাম দিবেন। যার মাধ্যমে প্রচুর সম্মান এবং সম্মানী অর্জন করা সম্ভব। যা জাতীয় আয়ে যোগ হবে।

৪. বাংলাদেশের অধিকাংশ হাফেজী মাদরাসায় শিক্ষার্থী ও শিক্ষক এর অনুপাত বিজ্ঞান ভিত্তিক নয়। সর্বোচ্চ ২০-২৩ শিক্ষার্থীকে একজন শিক্ষক নিয়ন্ত্রন করতে পারে; অথচ ৫০ শিক্ষাথীকেও একজন হাফিজ সাহেব পরিচালনা করতেও দেখা যায়। সে জন্য বিরাজমান অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার এবং যোগ্যতা সম্পন্ন হাফিজ তৈরির লক্ষে হাফেজী মাদরাসায় শিক্ষক বৃদ্ধি কতে হবে।

৫. আমাদের দেশে নানা ধরনের প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়। যদি পবিত্র কোরআন সংযুক্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়, তাহলে এর মাধ্যমেও হাফিজ সাহেবগণ কোরআনকে ইয়াদ বা জেহেনে ধরে রাখতে পারবেন।

পরিশেষে মুসলমানদের অহংকারের অনন্য সম্পদ "হাফিজুল কোরআন" সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সকল ঈমানদ্বার ভাইদের এ বিষয়ে কাল বিলম্ব না করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার আহ্বান যানাচ্ছি। বিশেষ করে সমাজসেবক, মসজিদ কমিটির সদস্য ও সমাজের দায়িত্বশীল বা ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি বেশি কাম্য। মাহে রমাদ্বানে আপনার মসজিদে ২ জনের পরিবর্তে অবশ্যই কমপক্ষে ৪-৫ জন হাফিজ নিয়োগ বিষয়ে জরুরী চিন্তা করবেন। দেখবের আপনার এলাকায় ইসলামী পরিবেশ বিরাজ করছে। আপনার এলাকায় সকল প্রকার মসিবত হতে রক্ষা পাবে (ইনশা আল-াহ)।

লেখক: আলেম ও কলামিস্ট, ঢাকা।

www.sunnibarta.com

কোরআন হাদিসের আলোকে হাযির–নাযির

মাওলানা কাজী মুহাম্মদ মু'ঈনুদ্দীন আশরাফী

'হাযির' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– সামনে উপস্থিত থাকা, অনুপস্থিত না থাকা। 'নাযির' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি, দ্রষ্টা, চোখের মণি, নাকের রগ, চোখের পানি ইত্যাদি। আর হাযির ও নাযির–এর পারিভাষিক অর্থ হলো– পবিত্র ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি একই স্থানে অবস্থানপূর্বক সমগ্র জগতকে নিজ হাতের তালুর মত দেখা, দূরে–কাছের আওয়াজ শুনতে পারা, অথবা এক মুহূর্তে সমগ্র ভ্রমণ করার ক্ষমতা রাখা। অনেক দূরে অবস্থানকারী বিপদগ্রস্থকে সাহায্য করতে পারা। এক্ষেত্রে আসা–যাওয়া রূহানীভাবে অথবা রূপক শারীর নিয়ে বা আসল দেহ নিয়ে হতে পারে।

অতএব, আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীগণ হুজুর (সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম) এর ক্ষেত্রে 'হাযির ও নাযির' হওয়ার যে আক্বীদা পোষণ করি এর অর্থ এ নয় যে, নবী করিম (দ:) স্বশরীরে প্রত্যেক স্থানে, প্রত্যেকের সামনে উপতিস্থ আছেন; বরং র্মমার্থ হলো– রূহ বা আত্মা যেভাবে দেহের প্রত্যেক অংশে উপস্থিত, অনুরূপভাবে উভয় জগতের প্রাণ, প্রিয় নবী (দ:) এর নুরানী মৌলিক অস্থিত্ব জগতের প্রতিটি অনু–পরমাণুতে অস্থিত্ববান। ফলে তিনি নূরে নুবুওয়াতের মাধ্যমে একই সময়ে পৃথিবীর একাধিক স্থানে অবস্থান করতে পারেন।

আল-াহর ওলীগণ অধিকাংশ সময় জাগ্রত অবস্থায় কপালের চোখে– হুজুর (দ:) কে দেখেছেন। আর তিনিও তাঁদেরকে তাঁর কৃপাদৃষ্টি দ্বারা ধন্য করেছেন। এমতাবস্থায় হুজুর (দ:) নিজ গোলামদের সামনে উপস্থিত থাকাই হলো তাঁর 'হাযির' হওয়া। আর আপন গোলামদের আপন বরকতময় দৃষ্টিতে দেখার মর্মার্থ হলো 'নাযির' হওয়া। উলে-খ্য যে, এখানে শিরক–এর কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ, হুজুর (দ:) এর 'হাযির–নাযির' হওয়ার ক্ষমতা মহান আল-াহ্ প্রদত্ত। আর আল-াহ তা'য়ালার যাবতীয় গুণাবলী স্বত্তাগত ও নিজস্ব।

উপরোক্ত আলোচনার সার সংক্ষেপ হলো– হুজুর (দ:) সৃষ্টিজগতে সবকিছু নূরে নুবুওয়াতের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করতে পারেন এবং একই সময় একাধিক স্থানে রূহানীভাবে, রূপক দেহ সহকারে এমনকি আসল দেহ মুবারক সহকারে উপস্থিত থাকতে পারেন। এটাই হলো– 'হাযির–নাযির' আক্বীদার মূলকথা।

এতে শিরক–কুফরের ন্যুনতম সম্ভাবনাও প্রশ্ন আসে না। যারা প্রিয় নবী (দ:) সর্ম্পকে 'হাযির–নাযির"র আক্বীদা পোষণ করাকে শিরক–কুফর বলে সরল প্রাণ মুসলমানদের বিভ্রান্ড় করছে, তারা 'হাযির–নাযির' বলতে কি বুঝেছে তারাই জানে। আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত–এর অনুসারী ওলামা কেরাম হাযির–নাযির বলতে কি বুঝে থাকি তা উপরে পেশ করলাম এবং এ আক্বীদার পক্ষে কুরআন, হাদীস, ইমাম ও ওলামা কেরামের মতামত নিম্নে পেশ করলাম।

আয়াত–ই কুরআনের আলোকে 'হাযির–নাযির':

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً - وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً

এক. "হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে হাযির ও নাযির, সুসংবাদদাতা, ভয়প্রদর্শনকারী, আল-াহর অনুমতিক্রমে আল-াহর দিকে আহ্বানকারী ও আলোকময়কারী সূর্য হিসেবে প্রেরণ করেছি।

আলোচ্য আয়াত 'শাহিদ' শব্দের অর্থ হাযির ও নাযির। যথা-

ইমাম রাগিব ইসফাহানী (রহ:) স্বরচিত 'কিতাবুল মুফরাদাত'– এ বলেন-

الشُّهُودُ والشَّهَادَةُ: الحضور مع المشاهدة، إمّا بالبصر، أو بالبصيرة،

–'শাহিদ' স্বচক্ষে অথবা অন্ড়র্দৃষ্টি দ্বারা প্রত্যক্ষ করত: উপস্থিত তাঁকেই বলা হয়।"[১] এখন প্রশ্ন হলো তাঁকে কার বা কাদের সাক্ষী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে? এর

[১] .রাগেব ইস্পাহানী, মুফরাদাত ফি গারায়েবুল কোরআন, ৪৬৫পৃ.

উত্তর আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরগণ পেশ করেছেন–

যথা আল-ামা ইমাম আবুচ্ছাউদ (রহ:) বলেন-

{يا أيها النبي إنَّا أرسلناك شَاهِداً} على مَن بُعثتَ إليهم تُراقبُ أحوالهم وتُشاهدُ أعمالَهم وتتحمَّلُ منهم الشَّهادةَ بما صدرَ عنهُم منَ التَّصديقِ والتَّكذيبِ وسائرِ ما هُم عليهِ من الهدى والضَّلالِ وتُؤدِّيها يومَ القيامةِ أداءً مقبولاً فيما لَهُم وما عليهم

"প্রিয় নবী (দ:) কে উম্মতের নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলীর সাক্ষী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে- অবস্থাসমূহ পর্যবেক্ষণ করা, আমলসমূহ প্রত্যক্ষ করা, তাদের সত্যায়ন ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার সাক্ষ্য প্রদান, তাদের হেদায়াত ও গোমরাহী সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান। এসব বিষয়ে তিনিই সাক্ষ্য প্রদান করবেন।"[১]

আলোচ্য আয়াতের প্রায় একই ধরনের তাফসীর করা হয়েছে নিম্ন বর্ণিত নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহে:

তাফসীরে বারযাভী শরীফ জালালাইন শরীফতাফসীরে জুমালর ুহুল মা'আনী।

উপরে বর্ণিত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি যাদের প্রতি প্রেরিত, তিনি তাঁদের জন্য হাযির ও নাযির। তিনি উম্মতের যাবতীয় বিষয় প্রত্যক্ষ না করলে কিভাবে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। আর তিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতি প্রেরিত। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল ( ) ইরশাদ করেন-

وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً

"আমি সকল সৃষ্টির জন্য প্রেরিত হয়েছি।"[২] মহান রব তা'য়ালা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন-

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً

-"বাস্ড়বতা হলো এ যে, আমি তোমাদেরকে (মুসলমানগণ) সকল উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট করেছি, যাতে তোমরা মানুষের সাক্ষী হও। আর রাসূল মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের পর্যবেক্ষণকারী।"[৩]

তিন.

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا .

"তখন কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী পেশ করব। আর হে রাসূল! আপনাকে ওরা সবার পর্যবেক্ষণকারী হিসেবে পেশ করব।"[৪] আলোচ্য দুই আয়াতের মর্মকথা হলো- কিয়ামত দিবসে অন্যান্য নবীগণের উম্মতগণ তাঁদের নিকট নবীগণের দ্বীন প্রচারের বিষয়টি অস্বীকার করবে। তখন নবীগণ (আলাইহিস সালাম) নিজের পক্ষে উম্মতে মুহাম্মদীকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করবেন। তখন তাদের সাক্ষ্য ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসবে যে,তোমরা তো ওইসব নবীর যুগে ছিলে না। না দেখে তোমরা কিভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছ? তখন উম্মতে মুহাম্মদী বলবেন আমাদেরকে আমাদের নবী বলেছেন। তখন হুজুর (দ:) এর সাক্ষ্য নেয়া হবে। তখন তিনি দু'টি বিষয়ে সাক্ষী দেবেন। একটা হলো– নবীগণের দ্বীন প্রচারের পক্ষে, অপরটি– তাঁর উম্মতের সাক্ষ্যের প্রসঙ্গে। তখন হুযুর (দ:) এর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং নবীগণের পক্ষে রায় হবে।

তখন কিন্তু এ প্রশ্ন উঠবে না যে, হযরত মুহাম্মদ মুস্ড়ফা (সা:) ও তো অন্যান্য নবীগণের যুগে ছিলেন না। তিনি কিভাবে সাক্ষ্য দেবেন। তাহলে প্রমাণিত হলো পূর্বাপর সব কিছু তিনি প্রত্যক্ষ করেন। অর্থাৎ– তিনি 'হাযির ও নাযির'।

তিনি সমগ্র সৃষ্টির প্রতি রাসূল হিসেবে প্রেরিত।

অর্থাৎ- 'শাহিদ' হুযুর দ:) এর গুণবাচক নামসমূহের অন্যতম। কেননা তিনি ক্বিয়ামত দিবসে নবীগণের দ্বীন প্রচারের পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন, যা হবে তাঁদের উম্মতের বিপক্ষে। অনুর ুপভাবে আপন উম্মতের সাক্ষীও দেবেন এবং তাদেও সাফাই বর্ণনা করবেন। (অর্থাৎ- আমার উম্মতগণ অন্যান্য নবীগণের পক্ষে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন, সেটা যথাযথ। কারণ, তারা সাক্ষ্য দেয়ার যোগ্য)।

[১] .আবুস সাউদ, তাফসীরে আবুস্-সাউদ, ৭/১০৭-১০৮পৃ. (শামিলা)
[২] .মুসনাদে আহমদ, ১৫/৯৫পৃ.হাদিস, ৯৩৩৭, মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, সহিহ মুসলিম, হাদিস ঃ ৫২৩
[৩] .সুরা বাক্বারা, আয়াত নং. ১৪৩
[৪] .সুরা নিসা আয়াত নং.৪১

অথবা তিনি অবস্থা প্রত্যক্ষকারী হিসেবে শাহিদ যেন তিনি অবস্থা প্রত্যক্ষকারী হিসেবে শাহিদ যেন তিনি অবস্থার দ্রষ্টা। (তাসকীনুল খাওয়াতির, কৃত: আল-হামা আহমদ সাঈদ কাযেমী (রহ:) পৃ: ৯৫ও ৯৬

চার.-النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

"নবি মু'মিনদের প্রাণের চেয়েও অধিক নিকটে।"[১] দেওবন্দ মাদ্রসার কথিত প্রতিষ্ঠাতা মৌং কাছেম নানুতভী বলেন- আলোচ্য আয়াতে -أَوْلَى শব্দটির অর্থ হলো অধিক নিকটবর্তী। (তাহ্যীরুন্নাস, পৃ: ১০, কৃত: মৌং কাছেম নানুতভী, কুতুবখানা রহীমিয়া, দেওবন্দ কর্তৃক প্রকাশিত)

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমরা একটি হাদিসে পাকের দিকে তাকালে (أَوْلَى) শব্দের অর্থ স্বয়ং নবীজি নিকটে করেছেন। হযরত আব্দুল-াহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (ম) ইরশাদ করেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ القِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاَةً.

"হযরত আব্দুল-াহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল ( ) ইরশাদ ফরমান, কিয়ামতের দিনে সেই ব্যক্তি আমার অতি নিকটে থাকবে যে আমার প্রতি অধিক দরূদ পড়ছে।"[২] এ হাদিসের অর্থ সকলেই নিকটে অর্থ করে থাকেন। যেমন এ হাদিসের ব্যাখ্যায় আল-ামা মোল-া আলী ক্বারী (রহ:) বলেন- أَيْ: أَقْرَبُهُمْ -"এখানে আওলা অর্থ নিকটে।"[৩]

অতএব, অতি সহজে প্রমাণিত হলো-যিনি ঈমানদারদের প্রাণের চেয়ে অধিক নিকটবর্তী, তিনি নিশ্চয়ই ঈমানদারের জন্য হাযির ও নাযির। এভাবে আরো অনেক আয়াত দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সাল-ল-াহু আলাইহি ওয়াসাম) এর নিকট উম্মতের কোন বিষয় গোপন নয়। তিনি সবকিছুই প্রত্যক্ষ করেন। আর ভাল-মন্দ সবকিছুর কিয়ামত দিবসে সাক্ষ্য দেবেন। সাক্ষীকে অবশ্যই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হতে হয়।

হাদিস শরীফে আলোকে 'হাযির ও নাযির':

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ-

-"হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম দ::) (মূতার যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালনকারী হযরত যায়েদ ইবনে হারেছ, জাফর ইবনে আবি তালেব, আবদুল-াহ্ ইবনে রাওয়াহা (রা:) এর শহীদ হবার সংবাদ দিয়েছেন মদীনাবাসীর নিকট এ সংবাদ আসার আগে। তিনি মদীনা শরীফে অবস্থানরত থেকে বলেন-

---

[১]. সূরা আহযাব আয়াত নং ৬

[২]. আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২০৭পৃ. হাদিস,৩০৬, ও ৬/৩২৫পৃ. হাদিস.৩১৭৮৭, তিরমিযী : আস্-সুনান : ২/৩৫৪ পৃ: হাদিস : ৪৮৪, ইবনে হিব্বান : আস্-সহিহ : ৩/১৯২ পৃ. হাদিস : ৯১১, যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ৪/২০৯ পৃ: রাভী : ৯৪৪০,সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ১৬০ পৃ: হাদিস : ২৬৮, সাখাভী : আল কওলুল বদী : ২৪১ পৃ: ইবনে হাজার হায়সামী : মাওরিদুয্ যামান : ১/৫৯৪পৃ. হাদিস : ২৩৮৯, ইবনে আছির,জামিউল উসূল, ৪/৪০৫পৃ. হাদিস ঃ ২৪৭৫, নাওয়াবী, খুলাসাতুল আহকাম, ১/৪৩৯পৃ. হাদিস ঃ ১৪৩৩, তিনি বলেন সনদটি হাসান, মিয্যী, তুহফাতুল আশরাফ বি মা'রিফাতুল আতরাফ, ৭/৬৯পৃ. হাদিস ঃ ৯৩৪০, ইবনুল ইরাকী, তাখরীযে আহাদিসুল ইহইয়াউল উলূম, ১/৩৬৬পৃ. সুয়ূতি, আদ্দুরল মুনতাসিরাহ, ১/৮৫পৃ. হাদিস ঃ ১৪০, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ১/৩৫১পৃ. হাদিস,৩৮১৯, আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/২৩৯ পৃ: হাদিস : ৮৩৫, সুয়ূতি : আদ দুররুল মুনতাসিরাহ : ৫/২১৮পৃ: ইমাম বুখারী : তারীখুল কবীর : ৫/১৭৭ পৃ: হাদিস ঃ ৫৫৯, ইমাম আদী : আল কামিল : ৬/২৪২পৃ. ইমাম দারেকুতনী : আল ইল্লল : ২৪১ পৃ. বায়হাকী : আস-সুনানুল কোবরা : ৩/২৪৯পৃ. হাদিস : ৫৭৯১, বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান : ৩/১২৯ পৃ. হাদিস :১৪৬২, ইমাম আবু ই'য়ালা : আল-মুসনাদ : ৮/৪২৮পৃ. হাদিস : ৫০১১, ইমাম মুনযিরী : তারগীব ওয়াত তারহীব : ২/৩২৭ পৃ. হাদিস : ২৫৭৫, খতিব তিবরিযী : মিশকাত : ১/১১৮ পৃ. হাদিস : ৯২৩, মোল-া আলী ক্বারী : মেরকাত : ১/৮-৯ পৃ. হাদিস : ৯২৩, সুয়ূতী : জামিউস সগীর : ১/১৬৮ পৃ. হাদিস : ২২৪৯, আলবানী : দ্বঈফু তারগীব : ৩/২৮০ পৃ.হাদিস : ২৫৭৫, দায়লামী : মুসনাদিল ফিরদাউস : ১/৮১ পৃ. হাদিস : ২৫০, হাকিম নিশাপুরী : আল-মুস্তাদরাক : ২/৪২১ পৃ. দিম্নরী মালেকী, মাযালিসে দিম্নরী, ১/৪২৯পৃ. হাদিস,১২৮, বগাবী, শরহে সুন্নাহ, ৩/১৯৭পৃ. হাদিস,৬৮৬, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১/৪৮৯পৃ. হাদিস,২১৫১, দরবেশহুত, আস্-সুনানিল মুত্তালিব, ১/৭৫পৃ. হাদিস,২৯৫, মিয্যী, তাহযীবুল কামাল, ১৫/৪৮২ ক্রমিক.৩৫০৯,

[৩]. মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ২/৭৪৩পৃ. হাদিস নং ৯২৩

এখন ঝান্ডা যায়েদ নিয়েছে। অত:পর তাকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। অবশেষে ঝান্ডা আল-াহ্র তরবারী খালেদ ইবনে ওয়ালিদ নিয়েছে। সর্বশেষ আল-াহ্ মুসলমানদের বিজয় দান করেছেন।"[১]

প্রিয় নবী (দ:) মদীনা শরীফে অবস্থান করে মদীনা শরীফ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত মূতার যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এতে সহজেই প্রমাণিত হয় যে, তাঁর জন্য দূরে কাছে সমান। তিনি সমানভাবে সব প্রত্যক্ষ করেন, এটাই হলো 'হাযির ও নাযির' বিষয়ক আক্বীদার মূলকথা।

দুই. হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলে আকরাম ( ) ইরশাদ করেন-

وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ، وَإِنِّي لأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي

-"তোমাদের সাথে সাক্ষাতের স্থান হাউযে কাউছার। আর আমি এখান থেকে হাউযে কাউছার দেখছি।"[২]

আলোচ্য হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত হলো যে, প্রিয় নবী (দ:) আপন অবস্থান থেকে ক্বিয়ামত দিবসের 'হাউযে কাউছার' দেখেন। সুতরাং তাঁর জন্য অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমান। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (দ.) বলেন-

أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي

-"তোমরা নিজেদের কাতার সোজা এবং একজনের সাথে অপরজন লেগে দাঁড়াও। কারণ, আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে পেছনেও দেখি।"[৩]

-"তোমরা নিজেদের কাতার সোজা এবং একজনের সাথে অপরজন লেগে দাঁড়াও। কারন, আমি নিশ্চয় তোমাদেরকে পিছনেও দেখি।"[৪]

আলোচ্য হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত হলো যে, তিনি সামনে যেভাবে দেখেন, পেছনেও একইভাবে দেখেন। এর সমার্থক অসংখ্য হাদীস সেহাহ্ সিত্তায় আছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে,নবীর জন্য দূরে-কাছে, সামনে-পেছনে, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব সমান। সুতরাং তিনি আপন অবস্থান থেকে সবকিছু জানতে ও দেখতে পারেন। এটাই 'হাযির-নাযির' বিষয়ক আক্বীদা।

ইমাম-আলিমদের অভিমত:

এক.

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল-ামা মোল-া আলী ক্বারী হানাফী (রহ:) মিরকাতের ২য় খন্ডে মাসাজিদ অধ্যায়ে লিখেন-

وقال الغزالى سلم عليه اذا دخلت فى المسجد فانه عليه السلام يحضر فى المسجد ـ

-"হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (রহ:) বলেছেন, আপনি যখন মসজিদে প্রবেশ করবেন, তখন হুযুর (দ:) কে শ্রদ্ধার সহিত সালাম দিবেন। কারণ তিনি মসজিদ সমূহে বিদ্যমান আছেন।"[৫]

দুই.

এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস রয়েছে যে-

وَعَنْ علقمة إِذَا دَخَلْتُ الْمَسْجِد أَقُول السَّلَام عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيّ وَرَحْمَةُ اللَّه وَبَرَكَاتُه صَلّى اللّٰه

[১]. ক. খতিব তিবরিযী ঃ মেশকাত ঃ ৪/৩৮৪ পৃ. হাদিস ঃ ৫৮৮৯
খ. বুখারী ঃ আস-সহীহ ঃ ৭/৫১২ পৃ. হাদিস ঃ ৪২৬২

[২]. ক. খতিব তিবরিযী ঃ মেশকাত ঃ ৪/৪০২ পৃ. হাদিস ঃ ৫৯৫৮
খ. বুখারী ঃ আস-সহীহ ঃ ৭/৩৪৮ হাদিস ঃ ৪০৪২
গ. মুসলিম ঃ আস-সহীহ ঃ ৪/১৭৭৫ হাদিস ঃ ২২৯৬
ঘ. নাসায়ী ঃ সুনানে কোবরা ঃ ৪/৬১ পৃ. হাদিস ঃ ১৯৫৪
ঙ. আহমদ ইবনে হাম্বল ঃ আল-মুসনাদ ঃ ৪/১৪৮
চ. মুসলিম ঃ আস্-সহীহ ঃ প্রথম খণ্ড ঃ হাদিস ঃ ৩০

[৩]. ক. খতিব তিবরিযী ঃ মেশকাত ঃ ১/২১৭ পৃ. হাদিস ঃ ১০৮৬
খ. বুখারী ঃ আস-সহিহ ঃ কিতাবুস্-সালাত ঃ ২/২০৮ হাদিস ঃ ৭১৯
গ. আবু নুয়াঈম ঃ দালায়েলুল নবুয়ত ঃ পৃ. ৭১, হাদিস ঃ ৫৬
ঘ. আবু আওয়ানাহ ঃ আল-মুসনাদ ঃ ১/৪৬২, হাদিস ঃ ১৭১৭
ঙ. আবু আওয়ানাহ ঃ আল-মুসনাদ ঃ ১/৪৬২, হাদিস ঃ ১৭১৫
চ. আবু আওয়ানাহ ঃ আল-মুসনাদ ঃ ১/৪৬১, হাদিস ঃ ১৭০৭
ছ. আল-মাকদাসী ঃ আল-আহাদিসুল মুখতার ঃ ৬/১০৪ হাদিস ঃ ২০৯২
জ. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতী ঃ জামেউস-সগীর ঃ ১/৮৫ হাদিস ঃ ১৩৭০-১৩৭২
ঝ. ইউসূফ নাবহানী ঃ ফতহুল কবীর ঃ ১/২০৮ হাদিস ঃ ২২৫৮
ঞ. মুসলিম ঃ আস-সহীহ ঃ ১/৩২৪ পৃ. হাদিস ঃ ৪৩৪ এবং ১২৫
ট. নাসায়ী ঃ আস-সুনানুল কোবরা ঃ ২/৯২ পৃ. হাদিস ঃ ৮১৪

[৪]. সহিহ বুখারী, মিশকাতুল মাসাবিহ,

[৫]. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মেরকাত : ২য় খন্ড, মসজিদ অধ্যায়

www.sunnibarta.com

-"হযরত আলকামা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন যখন তোমরা মসজিদে প্রবেশ করবে যে ঘরে কেউ না থাকে, সে ঘরে (প্রবেশের সময়) বলবেন, হে নবী আপনার প্রতি সালাম, আপনার উপর আল-াহর অশেষ রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।"[১] তাই বুঝা গেল রাসূল উপস্থিত আছেন বলেই আমরা কেউ মসজিদে না থাকলেও তাকে সালাম দিতে হবে।

তিন.

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস অল-ামা জালালুদ্দীন সুয়ূতি(রহ:) {ওফাত.৯১১হি.} এর বিখ্যাত গ্রন্থ "শরহুস সূদুরে" লিখেন-

ان اعتقد الناس ان روحه ومثاله فى وقت قرأءة المولد وختم رمضان و قرأءة القصائد يحضر جاز -

-"যদি কেউ বিশ্বাস পোষণ করে যে, হুযুর (দ:) এর পবিত্র র"হ মোবারক ও তাঁর জিসমে মিছালী মীলাদ পাঠের সময়, রমযানে খতমে কুরআনের সময় এবং নাত পাঠ করার সময় উপস্থিত হয়, তবে এ বিশ্বাস পোষণ করা জায়েয।"

যে আক্বীদা বিশ্বাসকে ইমাম সুয়ূতী'র মত বিশ্ববরেণ্য আলেম জায়েয ও বৈধ বলেছেন, ওটাকেই আজকের ওহাবী ও বাতিল সম্প্রদায় 'শিরক' বলছে। তিনি আরও বলেন-

শুধু তাই নয় আল-ামা ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতি (রহ:) {ওফাত.৯১১হি.} এর প্রসিদ্ধ কিতাব [أَنْبَاءُ الْأَذْكِيَاءِ بِحَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ]এর ৭ পৃষ্ঠায় একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

النَّظَرِ فِي أَعْمَالِ أُمَّتِهِ وَالِاسْتِغْفَارِ لَهُمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ، وَالدُّعَاءِ بِكَشْفِ الْبَلَاءِ عَنْهُمْ، وَالتَّرَدُّدِ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ لِحُلُولِ الْبَرَكَةِ فِيهَا، وَحُضُورِ جِنَازَةِ مَنْ مَاتَ مِنْ صَالِحِ أُمَّتِهِ، فَإِنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ مِنْ جُمْلَةِ أَشْغَالِهِ فِي الْبَرْزَخِ كَمَا وَرَدَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ-

-"'উম্মতের বিবিধ কর্ম কান্ডের প্রতিদৃষ্টি রাখা, তাদের পাপরাশির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের বালা মসিবত থেকে রক্ষা করার জন্য দুআ করা, পৃথিবীর এক প্রান্ড় থেকে অপর প্রান্ড়ে আনাগোনা করা ও বরকত দান করা এবং নিজ উম্মতের কোন নেক বান্দার ওফাত হলে তার জানাযাতে অংশগ্রহণ করা, এগুলোই হচ্ছে হুযুর (দ:) এর সখের কাজ। অন্যান্য হাদিস থেকেও এসব কথার সমর্থন পাওয়া যায়।"[২]

চার.

আল-ামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ:) বলেছেন- "উম্মতের আলেমদের মধ্যে অধিক মতপার্থক্য ও অধিক মাযহাব সত্ত্বেও একটি মাসআ'লায় এক ব্যক্তিরও দ্বিমত নেই যে, হুজুর (দ:) কোন র"পক অর্থের সম্পৃক্ততা ও সুক্ষ ব্যাখ্যার অবকাশ ব্যতিরেকেই আসল হায়াত সহকারে জীবিত আছেন এবং উম্মতের আমলসমূহের ক্ষেত্রে হাযির ও নাযির। (তাসকীনুল খাওয়াতির, পৃ: ৯৭)

পাঁচ.

এখন দেওবন্দীদের পীর ও গুর" এবং পীরানে পীর হাজী এমদাদুল-াহ মুহাজিরে মক্কী (রহ:) থেকে মীলাদে নবীজী হাজির-নাজির হওয়া প্রসঙ্গে দলিল পেশ করছি। তিনি তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "শামায়েলে এমদাদীয়া" এর মধ্যে বলেন,

البتہ وقت قیام کے اعتقاد تولد کا نہ کرنا چاہئے - اگر احتمال تشریف آوری کا کیا جائے مضائقہ نہیں کیوں کہ عالم خلق مقید برزمان ومکان ہے - لیکن عالم امر دونوں سے پاك ہے – پس قدم رنجہ فرمانا ذات بابر کات کا بعید نہیں -

-"মীলাদ শরীফে" কিয়াম করার সময় হুযুর (দ:) এখন ভুমিষ্ট হচ্ছেন এ ধরনের বিশ্বাস না রাখা উচিত। আর যদি মাহফিলে তাশরীফ আনেন এমন বিশ্বাস রাখে, তাহলে অসুবিধা নেই, কারণ এ নশ্বর জগতে কাল ও

[১]. ইমাম কাজী আয়াজ : শিফা তাহরিফে হুকুকে মোস্তফা : ২/৬৭ পৃ.

[২]. সুয়ূতি,আল-হাভী লিল ফাতওয়া,২/১৮৪-১৮৫পৃ.দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।

স্থানের সাথে সম্পৃক্ত। আর পরকাল স্থান-কালের সম্পর্ক থেকে মুক্ত।"[১]

অতএব হুযুর (দ:) মাহফিলে তাশরীফ আনয়ন করা ও উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নয়। উক্ত গ্রন্থটি মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব কৃত সত্যায়িত করা হয়েছিল। যা দেওবন্দ এর "মাকতুবায়ে থানবী" লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত।

শুধু তাই নয় হাজী সাহেব আরও বলেন,

رہایہ اعتقاد کہ مجلس مولد میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہو تے ہیں اسی اعتقاد کو کفر و شرک کہنا حد سے بڑھنا کیوں کہ یہ امر ممکن عقلا ونقلا – بلکہ بعض مقامات پر اس کا وقوع بھی و ہوتاہے -

-"এ আক্বীদা ও বিশ্বাস রাখা যে, মিলাদ মাহফিলে হুযুর পুরনুর সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম উপস্থিত হন, এটা 'কুফর' বা 'শিরক' নয়, বরং এমন বলা সীমা লঙ্ঘন ছাড়া কিছুই নয়। কেননা এ বিষয়টি যুক্তিভিত্তিক ও শরীয়তের দলীলের আলোকে সম্ভব। এমনকি অনেকক্ষেত্রে বাস্ড়বে তা ঘটেও থাকে।"[২]

দেওবন্দী ওহাবীদের পীরানে পীর হাজী সাহেব বলেছেন, 'মীলাদ মাহফিলে হুজুর (দ:) উপস্থিত হন' এ আক্বীদা-বিশ্বাস কুরআন-হাদীস ও যুক্তিভিত্তিক দলীলসম্মত। এর বাস্ড়ব প্রমাণও আছেন। এ আক্বীদাকে কুফর ও শিরক যারা বলে তারা সীমা লংঘনকারী। অতএব, প্রমাণিত হলো, বর্তমান সুন্নী মুসলমানদের আক্বীদা-বিশ্বাস কুরআন-হাদীস সম্মত। আর এ আক্বীদাকে 'কুফর-শিরক'বলে ফতোয়াদানকারী ওহাবীগণ সীমালংঘনকারী।

ছয়.

দেওবন্দী ওহাবীদের বড় হুযুর মৌং রশিদ আহমদ গাংগুহী বলেন----

هم مرید بیقین داند که روح شیخ بیك مکان نیست پس هرجاکه مرید باشد قریب یابعید اگر چة از شیخ دوراست اما روحانیت اودور نیست چوں ایں امر محکم داردهر وقت شیخ زیاد داردور بط قلب پیدا اید وهردم مستفید بود مرید در حال واقعه محتاج شیخ بود شیخ رایقلب حاضر اورده بلسان حال سوال کند البته روح شیاخ باذن الله تعالی القاء خواهد کرد مگر ربط تام شرط است وبسبب ربط قلب شیخ را لسان قلب ناطق می شود وبسوئے حق تعالی راه می کشاید وحق تعالی اورا محدث می کند،

অর্থাৎ- মুরীদ ও দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস রাখবে যে, পীরের র"হ একস্থানে আবদ্ধ নয়, মুরীদ যেখানে হোক-দূরে বা নিকটে, যদিও পীরের দেহ থেকে দূরে, কিন্তু পীরের র"হ বা আত্মা থেকে দূরে নয়। এ ধরনের বিশ্বাস যখন মজবুত হয়ে যাবে, তখন সবসময় পীরকে স্বরণ করবে। তাহলে আ"ড়রিক সর্ম্পক সৃষ্টি হবে এবং সবসময় পীরের আত্মা থেকে উপকৃত হতে থাকবে। মুরীদ বিভিন্ন ঘটনায় পীরের মুখাপেক্ষী হয়, তখন পীরকে অ"ড়রে হাযির বা উপস্থিত জেনে বিশেষ অবস্থার মাধ্যমে পীরের নিকট জানতে চাইবে, তখন নিশ্চয়ই পীরের র"হ আল-াহ তা'য়ালার অনুমতিক্রমে অবশ্যই জানিয়ে দিতে পারেন। (এমদাদুস সুলুক, পৃষ্ঠা নং. ১০, কৃত: মৌং রশীদ আহমদ গাংগুহী)

এখানে দেওবন্দী ওহাবীদের অন্যতম নেতা মৌং রশীদ আহমদ গাংগুহী সাহেব পীরের আত্মাকে মুরীদ থেকে দূরে নয় বলে দৃঢ় আক্বীদা রাখতে বলেছেন এবং প্রয়োজন মুহূর্তে পীরকে অ"ড়রে হাযির জেনে জর"রী বিষয় জানা যায় বলে লিখেছেন। বর্তমান আমাদের দেশের ওহাবী মৌলভীদের নিকট আমাদের প্রশ্ন- রাসূল (দ:) মীলাদ মাহফিলে উপস্থিত হন এমন আক্বীদাকে কুফর ও শিরক বলে আপনারা ফতোয়া দিচ্ছেন। তাহলে আপনাদের পীরানে পীর হাজী সাহেবের ব্যাপারে আপনাদের ফতোয়া কি? উনি তো এ আক্বীদাকে কুরআন-হাদীস সম্মত বলে ফতোয়া দিয়েছেন। আর

[১] হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী : শামায়েলে এমদাদীয়া : পৃষ্ঠা নং-১০৩ পৃ. মাকতুবায়ে থানবী, দেওবন্দ।

[২]. আল্লামা হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী : কুল্লীয়াতে এমদাদীয়া, পৃ : ১০৩ মাকতুবাতে থানবী, দেওবন্দ, ভারত।

আপনাদের গাংগুহী সাহেব তো পীরের আত্মা মুরীদের নিকট হাযির থাকতে পারে বলে ফতোয়া দিয়েছেন। উনার ব্যাপারে আপনাদের ফতোয়া জানার অপেক্ষায় থাকলাম।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ আমাদের পেশকৃত ব্যাখ্যার আলোকে হাযির-নাযির আক্বীদা সম্পর্কে যথানিয়মে মোনাযারা সম্মুখ সমাধানে আসার আহ্বান রইল।

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এর পথে

বাংলাদেশ যুবসেনায় যোগদিন

বাংলাদেশ যুবসেনা
BANGLADESH JUBOSENA

-ঃ যোগাযোগ :-
মোহাম্মদ মোস্তাক আহমেদ
০১৯১১৯৬৪২৮৬
মোহাম্মদ আজিম চৌধুরী
০১৬১৬৫৫৫৬৬৪

www.sunnibarta.com

আল কুরআনে মাযহাব মানার দলীল

মুহাম্মদ শহিদুল-াহ্ বাহাদুর

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ-

-"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল-াহ্‌র আনুগত্য কর, তার রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা আদেশ প্রদানকারী (মুজতাহিদ ফকিহ) রয়েছেন তাদেরও।"[১]

আয়াতের তাফসীর

উক্ত আয়াতে মহান রব কুরআন সুন্নাহ্‌র আনুগত্যের পরেও মুজতাহিদ ফকীহ্‌গনকে অনুসরণের কথা বলেছেন। যা নিম্নে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

১. যেমন (أُولِى الأَمْرِ) আদেশ দাতার ব্যাখ্যায় ইমাম হাকেম নিশাপুরী (ওফাত. ৪০৫হি.) বর্ণনা করেন-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: ৫৯] قَالَ: «أُولِي الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ-

-"বিশিষ্ট সাহাবী হযরত জাবের বিন আব্দুল-াহ্ ( ) সুরা নিসার ৫৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, (কুরআন সুন্নাহের পর) উত্তম মুজতাহিদ ফকীহ্‌গণের আনুগত্য কর।"২ ইমাম হাকেম নিশাপুরী সনদটিকে সহিহ বলেছেন। আর ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

২. ইমাম মুনযিরী (৩১৯হি.) তার তাফসরে বর্ণনা করেন-

حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَيْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ جَابِرٍ: " {وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} ، قَالَ: الْفُقَهَاءُ "

-"হযরত জাবের ( ) বলেন, আয়াতের (উলিল আমরে মিনকুম) হলেন দ্বীনের ফকিহ্‌গণ।"৩

www.sunnibarta.com

লক্ষণীয় একটি বিষয় ঃসাহাবীদের কুরআনের তাফসীর মারফূ হাদিসের ন্যায়। ইমাম হাকেম নিশাপুরী (ওফাত. ৪০৫হি.) বলেন- وَتَفْسِيرُ الصَّحَابِيِّ عِنْدَهُمَا مُسْنَدٌ -"ইমাম বুখারী মুসলিমের নিকট সাহাবীদের তাফসীর মারফূ হাদিসের ন্যায়।"[৪] ইমাম নববী আশ্-শাফেয়ী (ওফাত. ৬৭৬হি.) বলেন-

وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ: تَفْسِيرُ الصَّحَابِيِّ مَرْفُوعٌ

-"সাহাবীদের কোরআনের কোন ব্যাখ্যা মারফূ হাদিসের ন্যায়।"[৫] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (ওফাত. ৯১১হি.) বলেন-

قَالَ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ ": لِيَعْلَمْ طَالِبُ الْحَدِيثِ أَنَّ تَفْسِيرَ الصَّحَابِيِّ الَّذِي شَهِدَ الْوَحْيَ وَالتَّنْزِيلَ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ.

-"ইমাম হাকেম নিশাপুরী ( ) তার 'মুস্তাদরাকে' বলেন......।"[৬] ইমাম আবু আব্দুল-াহ্ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহেদ মুকাদ্দাসী (৬৪৩হি.) বলেন-

الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا أَنَّ تَفْسِيرَ الصَّحَابِيِّ حَدِيثٌ مُسْنَد

-"ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের নিকট সাহাবীদের তাফসীর মারফূ হাদিসের ন্যায়।'৭ ইমাম যারকুশী (রহ.) { ওফাত. ৭৯৪হি. }বলেন-

يبحث فِي عَنْ صِحَّةِ السَّنَدِ وَالثَّانِي يَنْظُرُ فِي تَفْسِيرِ الصَّحَابِيِّ فَإِنْ فَسَّرَهُ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةِ فَهُمْ أَهْلُ اللِّسَانِ فَلَا شَكَّ فِي اعْتِمَادِهِمْ وَإِنْ فَسَّرَهُ بِمَا شَاهَدَهُ مِنَ الْأَسْبَابِ وَالْقَرَائِنِ فَلَا شَكَّ فِيهِ وَحِينَئِذٍ إِنْ تَعَارَضَتْ أَقْوَالُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ فَذَاكَ وَإِنْ تَعَذَّرَ قُدِّمَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَّرَهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ: "اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ"

-"...............।"[৮]

২. ইমাম হাকেম নিশাপুরী তার মুস্তাদরাকে ও ইমাম তবারী তার তাফসীরে এ আয়াতের তাফসীরে রঈসুল মুফাস্সির হযরত আব্দুল-াহ্ ইবনে আব্বাস ( ) হতে একটি ব্যাখ্যা সংকলন করেন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] يَعْنِي: «أَهْلَ الْفِقْهِ وَالدِّينِ

-"তিনি বলেন আদেশ দাতা হল দ্বীনের মুজতাহিদ ফকীহগন।"[৯]

৩, ইমাম সুয়ূতী উক্ত সাহাবী হতে আরেকটি ব্যাখ্যা নকল করেছেন-

وَأخرج ابْن عدي فِي الْكَامِل عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله {وأولي الْأَمر مِنْكُم} قَالَ: أهل الْعلم

-"ইমাম আদি তার কামিল গ্রন্থে সংকলন করেছেন যে মহান রবের আদেশ (উলিল আমরে মিনকুম হলেন) আহলে ইলম তথা মুজতাহি আলেমগণ।"[১০]

লক্ষণীয় একটি বিষয় ঃ আল-াহর নবীর পরে সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী যিনি কোরআন বুঝেছেন তিনি হলেন সাহাবী আব্দুল-াহ ইবনে আব্বাস ( ); কেননা তার জ্ঞানের জন্য স্বয়ং রাসূলে পাক দোয়া করেছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ( ) ও ইমাম বুখারী ( ) বর্ণনা করেন-

عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، ضَمَّنِي إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ–

-"তাবেয়ী হযরত ইকরামা ( ) বলেন, সাহাবী ইবনে আব্বাস ( ) বলেন, রাসূল ( ) তাঁর বক্ষের সাথে আমাকে লাগিয়ে দোয়া করেছেন, হে আল-াহ! তাকে তুমি কিতাবে (কুরআনের) জ্ঞান দান কর।"[১১]

হাদিস শাস্ত্রের এক জামাত ইমামগণ বলেছেন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ضَمَّنِي إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ–

-"হযরত ইবনে আব্বাস ( ) বলেন, রাসূল ( ) আমাকে তাঁর বক্ষে জরিয়ে ধরে দোয়া করলেন হে আল-াহ! তাকে তুমি হিকমাহ শিক্ষা দাও।"[১] ইমাম ইবনে মাযাহ ( ) হাদিসটি এই শব্দে সংকলন করেন-

عن ابن عباس، قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وقال: «اللهم علمه الحكمة، وتأويل الكتاب

-"ইবনে আব্বাস ( ) বলেন, রাসূল ( ) আমার বক্ষের সাথে তাঁর বক্ষ লাগিয়ে দোয়া করলেন হে আল-াহ! তাকে তুমি হিকমাত এবং কুরআনের তা'বীলের জ্ঞান দান কর।"[১২] তাই আমরা বুঝতে পারলাম যে সাহাবী ইবনে আব্বাস ( ) রাসূলের দোয়া ও স্বীকৃতিতেই সবচেয়ে কুরআনের জ্ঞানবান। আরও প্রমান পেশ করছি দেখুন-

عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ سَائِلًا عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ، فَلْيَسْأَلْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ»

-"হযরত ইবনে হুবায়রা ( ) বলেন, নিশ্চয়ই আমির-ল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব ( ) বলতেন যে তোমাদের কোরআনের বিষয়ে কারও কোন প্রশ্ন থাকলে তোমরা ইবনে আব্বাস ( )-এর কাছ থেকে জিজ্ঞাস করে নাও।"[১৩]

৩. ইমাম তবারী ( ) {ওফাত. ৩১০হি.} উক্ত আয়াতের ব্যাপারে সাহাবী ইবনে আব্বাসের ছাত্র বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম মুজাহিদ হতে সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا لَيْثٌ, عَنْ مُجَاهِدٍ, فِي قَوْلِهِ: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: ৫৯] قَالَ: «أُولِي الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ»

-"ইমাম মুজাহিদ ( ) বলেন, এখানে আদেশ দাতা হলেন ফিক্হ ও ইলমের অধিকারীগণ।"[১৪]

৪. ইমাম আব্দুর রায্যাক (২১১হি.)ও ইমাম তবারী (৩১০হি.) ইমাম মুজাহিদ অপর আরেকটি মত বর্ণনা করেন এভাবে-

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, عَنِ الثَّوْرِيِّ, عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ, عَنْ مُجَاهِدٍ, قَوْلُهُ: {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: ৫৯] قَالَ: «هُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ

-"তিনি বলেন (উলিল আমরে মিনকুম হলেন) ইলম ও ফিকহের অধিকারীগণ।"[১৫]

৫. ইমাম তবারী (৩১০হি.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন-

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ, قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ, فِي قَوْلِهِ: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: ৫৯] قَالَ: «أُولِي الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ»

www.sunnibarta.com

৬.বুখারী, আস্-সহিহ, হাদিস নং ৩৭৫৬, ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ও ফাযায়েলুস সাহাবা, হাদিস নং ১৯২৩, সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং ৩৮২৪

-"হযরত ইমাম আতা ইবনে সায়িব ( ) বলেন, (উলিল আমরে মিনকুম হলেন) ইলমের এবং ফিক্‌হের অধিকারীগণ।"[১৬]

৬. ইমাম তবারী ( ) ইমাম আতা থেকে আরেকটি বর্ণনা সনদসহ সংকলন করেন-

حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ, عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ, عَنْ عَطَاء: {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] قَالَ: «الْفُقَهَاءُ وَالْعُلَمَاءُ»

-"....তাবেয়ী হযরত আতা ( ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা মুজতাহিদ ফকিহ ইমামগনের এবং এলেমের অধিকারী আলেমদের আদেশকে মান্যকর।"[১৭]

৭, ইমাম ইবনে ওয়াহ্‌হাব কুরশী (ওফাত.১৯৭হি.) একটি বর্ণনা তার তাফসীরে সংকলন করেন এভাবে-

عن الأعمش، عن مجاهد في قول الله: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}، قال: هم الفقهاء والعلماء.

-"ইমাম মুজাহিদ ( ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা মুজতাহিদ ফকিহ ইমামগনের এবং এলেমের অধিকারী আলেমদের আদেশকে মান্যকর।"[১৮]

৭. ইমাম আব্দুর রায্‌যাক (২১১হি.)ইমাম তবারী ( ) {৩১০হি.) উলে-খ করেন-

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى, قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ, عَنِ الْحَسَنِ, فِي قَوْلِهِ: {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: ৫৯] قَالَ: «هُمُ الْعُلَمَاءُ»

-"তাবেয়ী ইমাম হাসান বসরী ( ) বলেন, (উলিল আমরে মিনকুম হলেন) আলেমগণ।"[১৯]

১৫. ইমাম মুনযিরী (৩১৯হি.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উলে-খ করেন-

عَنْ الضحاك، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " {أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} ، قَالَ: علماء الْمُسْلِمِينَ، وفقهاؤهم–

-"ইমাম যাহ্‌হাক ( ), (উলিল আমরে মিনকুম)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, মুসলিম উলামা এবং ফুকাহাগণ।"[২০]

১২. ইমাম রাজী ( ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

وَالْمُرَادُ مِنْ أُولِي الْأَمْرِ الْعُلَمَاءُ فِي أَصَحِّ الْأَقْوَالِ

-"*(উলিল আমরে মিনকুম)-এর বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা হল তার দ্বারা উদ্দেশ্য হল উলামাগণ।*'২১[১]

১৩. ইমাম ইবনে কাসীর ( ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: {وأولي الأمر منكم} يعني: أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهد، وعطاء، والحسن البصري

-"ইমাম আলী ইবনে আবি তালহা ( ) তিনি ইবনে আব্বাস ( ) হতে (উলিল আমরে মিনকুম)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর মমার্থ হল দ্বীনের মুজতাহিদ ফকিহগণকে অনুসরণ কর। অনুরূপ তাবেয়ী ইমাম মুজাহিদ, ইমাম আতা, ইমাম হাসান বসরী (রাহিমাহুমুল-াহ) অভিমত পেশ করেছেন।"[২২]

১৬, ইমাম ওয়াহেদী নিশাপুরী (ওফাত. ৪৬৮হি.) তার তাফসীরে বলেন- وهم العلماء والفقهاء -"(উলিল আমরে মিনকুম)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হল মুজতাহিদ ফুকাহা ও উলামাগণ।"[২৩]

১৭. ইমাম আবু মুজাফ্‌ফর আহমদ মার্‌'জী সাম'আনী হানাফী (ওফাত.৪৮৯হি.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

قَالَ ابْن عَبَّاس، وَجَابِر – وَهُوَ قَول جمَاعَة –: هم الْعلمَاء وَالْفُقَهَاء

-"সাহাবী ইবনে আব্বাস ( ) ও হযরত জাবের ( ) এবং এক জামাতের মতে (উলিল আমরে মিনকুম) হলেন মুজতাহিদ ফুকাহা ও উলামাগণ।"[২৪]

২১. ইমাম আবু হাইয়্যান আন্দুলুসী (ওফাত.৭৪৫ হি.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

وَقَالَ جَابِرٌ، وَالْحَسَنُ، وَعَطَاءٌ، وَأَبُو الْعَالِيَةِ، وَمُجَاهِدٌ أَيْضًا: الْعُلَمَاءُ

-"সাহাবী হযরত জাবের, তাবেয়ী হাসান বসরী, আতা, আবুল আলিয়া এবং মুজাহিদ (রাহিমাহুমুল-াহ)সহ অনেকে (উলিল আমরে মিনকুম) দ্বারা মুজতাহিদ উলামাদেরকে বুঝিয়েছেন।"[২৫]

হাদিসের আলোকে মাযহাব ঃ

১৬. ফখরুদ্দীন রাজী, তাফসীরে কাবীর, ২/৪০০পৃ.

www.sunnibarta.com

হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (দ.)ইরশাদ করেন-

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ.

-"তোমরা আমার পরে আবু বকর ও উমরকে অনুসরন করবে।"২৬

সাহাবীদের যুগে মাযহাব ঃ

১. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা.) -এর সাথে দুধ পানের সময় সীমা নিয়ে মতানৈক্য করতে গিয়ে বলেন,

لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ»، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: «لَا تَسْأَلُونَا وَهَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ»

-"দুধ পানকাল তখনই গ্রহণযোগ্য যখন তা দ্বারা হাড্ডি গজায় ও গোস্ড় সৃষ্টি হয় এতে হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা.) লোকদেরকে বলেন যতদিন পর্যস্ড় তোমাদের মাঝে এ ফকিহ (ইবনে মাসউদ) আলিম বিদ্যমান থাকবেন আমাদেও থেকে কোন মাসয়ালা জিজ্ঞেস করবেন না।" ২৭

২. হযরত যাহাবী (রহ.) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর পরিচয় দিতে গিয়ে উলে-খ করেন-

أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أم عبد الله حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه: من أكبر فقهاء الصحابة. كان فقهاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجعون إليها. تفقه بها جماعة.

-"তার উপনাম উম্মে আব্দুল-াহ, নবী (দ.)-এর অতি প্রিয় ছিলেন।......তিনি প্রধান প্রধান ফকিহদের অস্ড়র্ভুক্ত ছিলেন। ফকিহ সাহাবা (অনেক সময় সমস্যা সমাধানের জন্য) তাঁর শরণাপন্ন হতেন। একটি দল তাঁর থেকে ফিক্হ শিখেছেন।"২৮

ইজমার দলিল কুরআনুল মাজীদের সূরা নিসার ৫৯ এর ব্যাখ্যায়ইমাম আবু হাফস সিরাজুদ্দীন দামেস্কী হাম্বলী (ওফাত. ৭৭৫হি.) তার তাফসরি উলে-খ করেন-

وقوله: «وأولي الأمر منكم» يدل على الإجماع

-"কুরআনুল কারীমের এ আয়াত (উলিল আমরে মিনকুম) দ্বারা ইজমা প্রমাণিত।"[২৯]

ইমাম রাজী সূরা নিসার ৫৯ এর ব্যাখ্যায় লিখেন-তিনি আরও বলেন-

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: قَدْ دَلَّلْنَا عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةٌ

-"(উলিল আমরে মিনকুম) দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে ইজমা হুজ্জাত।"[৩০]

ইমাম আযম (রহ.) হাদিস বিষয়ে পারদর্শীতা ঃ

ইমাম মিয্যী (রহ.) (ওফাত.৭৪২হি.)ও ইমাম যাহাবী (৭৪৮হি.) ও ইবমে হাজার আসকালানী (৮৫২হি.) প্রমুখ রিজাবিদ ইবনে মুঈনের ছাত্র মুহাম্মদ ইবনে সাদ আলআউফি থেকে উদ্ধৃত করেন, আমি ইবনে মাঈনকে বলতে শুনেছি-

وَقَال مُحَمَّد بن سعد العوفِي : سمعت يَ حْيَى بن مَعِين يَقُولُ: كَانَ أَبُو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يحدث بما لا يحفظ.

-"আবু হানিফা হাদিসে নির্ভরযোগ্য-বিশ্বস্ড় ছিলেন। যে হাদিস তার মুখস্ড় সে হাদিস ছাড়া কোন হাদিস তিনি বলতেন না। যা তার মুখস্ড় নয় তা তিনি বলতেন না।"[১] এছাড়া তাঁরা ইবনে মাঈনের অন্য ছাত্র সালেহ ইবনে মুহাম্মদ আসাদী জায্রা (২৯৩হি.) থেকে উদ্ধৃত করেছেন তিনি বলেন ইবনে মাঈন বলেন-

وَقَال صالح بن مُحَمَّد الأسدي الحافظ: سمعت يَحْيَى بن مَعِين يَقُولُ: كَانَ أَبُو حنيفة ثقة فِي الحديث.

-" আবূ হানীফা হাদিসে নির্ভরযোগ্য ছিলেন।"৩১

২৬.মিয্যী, তাহজীবুল কামাল, ২৯/৪২৪পৃ.যাহাবী, সিয়ার" আলামিন আন্-নুবালা, ৬/৩৯৫পৃ. মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়র"ত, লেবানন, ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ১০/৪০১পৃ.-৪০২পৃ.।

হযরত শাহ জালাল (রহমাতুলি-ল আলাইহি)-এর সঙ্গী
৩৬০ আউলিয়াদের নামের তালিকা

১) হযরত শাহজালাল ইয়ামানী (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
২) হযরত শাহ পরান (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৩) হযরত শাহজাদা শেখ আলী ইয়ামানী (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৪) হযরত আলী ইয়ামানী (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৫) হযরত আরিফ ইয়ামানী (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৬) হযরত কামাল ইয়ামানী (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৭) হযরত মোহাম্মদ আইউব ইয়ামানী (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৮) হযরত শাহ তাজ উদ্দিন কোরেশী (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৯) হযরত শাহ হেলিম উদ্দিন কোরেশী (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১০) হযরত দাউদ কোরেশী (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১১) হযরত চাশনী পীর (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১২) হযরত জাকারিয়া আরবী (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৩) হযরত জৈন উদ্দিন আব্বাসী (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৪) হযরত নিজাম উদ্দিন বাগদাদী (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৫) হযরত খাজা অজিহ উদ্দিন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৬) হযরত খাজা আজিজ চিশতি (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৭) হযরত খাজা আমির উদ্দিন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৮) হযরত খাজা আলী (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৯) হযরত খাজা আদ (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
২০) হযরত খাজা আদিনা (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
২১) হযরত খাজা ইসা (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
২২) হযরত খাজা ইকবাল (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
২৩) হযরত খাজা এখতিয়ার (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
২৪) হযরত খাজা উমর চিশতি (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
২৫) হযরত খাজা তৈয়ব (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
২৬) হযরত খাজা দাউদ (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
২৭) হযরত খাজা নাসির উদ্দিন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
২৮) হযরত খাজা নাসির উদ্দিন ২য় (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
২৯) হযরত খাজা পীর (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৩০) হযরত খাজা বুরহান উদ্দিন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৩১) হযরত খাজা বাহাউদ্দিন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৩২) হযরত খাজা সলিম (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৩৩) হযরত খাজা সুফিয়ান (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৩৪) হযরত খাজা সিরাজ (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৩৫) হযরত সৈয়দ আজীজ (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৩৬) হযরত সৈয়দ আজিরান (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৩৭) হযরত সৈয়দ আলীম (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৩৮) হযরত সৈয়দ আহমদ কবির (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৩৯) হযরত সৈয়দ আহমদ (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৪০) হযরত সৈয়দ আব্বাস (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৪১) হযরত সৈয়দ আবু (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৪২) হযরত সৈয়দ আবুবকর (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৪৩) হযরত সৈয়দ আবদুল করিম (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৪৪) হযরত সৈয়দ আজিয়াল (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৪৫) হযরত সৈয়দ ইউসুফ (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৪৬) হযরত সৈয়দ ইয়াকুব (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৪৭) হযরত সৈয়দ ইসা (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৪৮) হযরত সৈয়দ ওমর সমরকন্দি (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৪৯) হযরত সৈয়দ ওসমান (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৫০) হযরত সৈয়দ কবীর (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৫১) হযরত সৈয়দ কুতুবউদ্দিন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৫২) হযরত সৈয়দ কাসিম (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৫৩) হযরত সৈয়দ জাহান (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৫৪) হযরত সৈয়দ জাওয়াহীর (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৫৫) হযরত সৈয়দ জলীল (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৫৬) হযরত সৈয়দ জমিল (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৫৭) হযরত সৈয়দ জাহাঙ্গীর (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৫৮) হযরত সৈয়দ তাজউদ্দিন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৫৯) হযরত সৈয়দ দৌলত (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৬০) হযরত সৈয়দ দৌলত ২য় (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৬১) হযরত সৈয়দ নাসির উদ্দিন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৬২) হযরত সৈয়দ নসর উল-াহ (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৬৩) হযরত সৈয়দ ফখর উদ্দিন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৬৪) হযরত সৈয়দ ফরিদ (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৬৫) হযরত সৈয়দ বদর (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৬৬) হযরত সৈয়দ বদর উদ্দিন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৬৭) হযরত সৈয়দ বাহাউদ্দিন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৬৮) হযরত সৈয়দ বাজ (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৬৯) হযরত সৈয়দ বায়েজীদ (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৭০) হযরত সৈয়দ বুজুর্গ (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৭১) হযরত সৈয়দ মুনাইম (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৭২) হযরত সৈয়দ মোকতার (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৭৩) হযরত সৈয়দ মহব্বত (রহমাতুলি-ল আলাইহি)

৭৪) হযরত সৈয়দ শাহ মোস্তফা (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৭৫) হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ গজনবী (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৭৬) হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ জান (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৭৭) হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ রওসন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৭৮) হযরত সৈয়দ রুকনুদ্দিন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৭৯) হযরত সৈয়দ সায়েফ উদ্দিন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৮০) হযরত সৈয়দ সিকন্দর (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৮১) হযরত সৈয়দ সিকন্দর ২য় (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৮২) হযরত সৈয়দ লাল (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৮৩) হযরত সৈয়দ হামজা (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৮৪) হযরত কাজী আজিম উদ্দিন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৮৫) হযরত কাজী আলিম উদ্দিন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৮৬) হযরত কাজী জালাল উদ্দিন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৮৭) হযরত কাজী ওমর (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৮৮) হযরত কাজী তাজ উদ্দিন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৮৯) হযরত কাজী ফয়জুল-াহ (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৯০) হযরত কাজী ফিরোজ (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৯১) হযরত কাজী ফৈয়াজ উদ্দিন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৯২) হযরত কাজী ফিরোজ ২য় (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৯৩) হযরত কাজী ফকির উদ্দিন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৯৪) হযরত গাজী মূলক (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৯৫) হযরত গাজী জয়েব (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৯৬) হযরত হাজী গাজী (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৯৭) হযরত হাজী ইউসুফ (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৯৮) হযরত হাজী আহমদ (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
৯৯) হযরত হাজী আহমদ ২য় (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১০০) হযরত হাজী খলীল (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১০১) হযরত হাজী খিজির (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১০২) হযরত হাজী মোহাম্মদ (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১০৩) হযরত হাজী মোহাম্মদ জাকারিয়া (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১০৪) হযরত হাজী জমশেদ (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১০৫) হযরত হাজী মোহাম্মদ দরীয়া (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১০৬) হযরত হাজী মোহাম্মদ শরিফ (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১০৭) হযরত হাজী লতীফ (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১০৮) হযরত হাজী ওমর চিশতি (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১০৯) হযরত হাজী কাসেম (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১১০) হযরত হাজী কাসেম ২য় (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১১১) হযরত হাজী শাহ চাঁদ (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১১২) হযরত শাহ চট কামাল (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১১৩) হযরত শাহ কামাল (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১১৪) হযরত শাহ নূর (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১১৫) হযরত শাহ কালু (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১১৬) হযরত শাহ মদন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১১৭) হযরত শাহ ফরাং (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১১৮) হযরত শাহ মালুম (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১১৯) হযরত শাহ রফিউদ্দিন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১২০) হযরত শাহ শামস উদ্দিন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১২১) হযরত শাহ সনজর (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১২২) হযরত শাহ সদর উদ্দিন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১২৩) হযরত শাহ সিকন্দর (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১২৪) হযরত শাহ সুন্দর (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১২৫) হযরত শাহবাজ আনসারী (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১২৬) হযরত শাহ আরফিন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১২৭) হযরত শাহ বদর (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১২৮) হযরত শাহ মাহমুদ (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১২৯) হযরত শাহ সোলতান (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৩০) হযরত শাহ সইদ (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৩১) হযরত শাহ বাগদার আলী (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৩২) হযরত শাহ দুধ মালেক (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৩৩) হযরত শাহজালাল উদ্দিন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৩৪) হযরত শাহ পাতা (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৩৫) হযরত শাহ শেখ জামাল উল-াহ (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৩৬) হযরত শাহ শেখ আহমদ (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৩৭) হযরত সৈয়দ হোসেন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৩৮) হযরত সৈয়দ আমীর (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৩৯) হযরত শেখ আসমর (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৪০) হযরত শেখ আবুল ফজল (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৪১) হযরত শেখ আব্দুল আলী (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৪২) হযরত শেখ আব্দুল করিম (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৪৩) হযরত শেখ আব্দুল-াহ (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৪৪) হযরত শেখ ইলিয়াছ (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৪৫) হযরত শেখ ইসা (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৪৬) হযরত শেখ ওমর (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৪৭) হযরত শেখ খাজা ওমর জাহান (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৪৮) হযরত শেখ ওসমান (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৪৯) হযরত শেখ কুতুব উদ্দিন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৫০) হযরত শেখ কালু (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৫১) হযরত শেখ খিজির খাসদবীর (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৫২) হযরত শেখ খিজির (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৫৩) হযরত শেখ গরীব (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৫৪) হযরত শেখ জকাই (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৫৫) হযরত শেখ জামাল (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৫৬) হযরত শেখ জামিল (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৫৭) হযরত শেখ জিয়াউদ্দিন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)

১৫৮) হযরত শেখ তাহির (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৫৯) হযরত শেখ নসরত (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৬০) হযরত শেখ নিয়ামত আলী (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৬১) হযরত শেখ মুসা (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৬২) হযরত শেখ মোহাম্মদ কিবারী (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৬৩) হযরত শেখ মোহাম্মদ দানা (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৬৪) হযরত শেখ শমস (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৬৫) হযরত শেখ শরফ উদ্দিন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৬৬) হযরত শেখ সাহদা (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৬৭) হযরত শেখ সাবু (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৬৮) হযরত শেখ ছলিম (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৬৯) হযরত শেখ সালেহ (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৭০) হযরত শেখ সিরাজ উদ্দিন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৭১) হযরত শেখ সদর (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৭২) হযরত শেখ হেলিম উদ্দিন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৭৩) হযরত শেখ হোসেন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৭৪) হযরত শেখ হোসেন ২য় (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৭৫) হযরত আজিজ চিশতি (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৭৬) হযরত হাফেজ আতাউল-াহ (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৭৭) ইমাম শুকুর উল-াহ (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৭৮) হযরত মোজাফ্ফর বিহারী (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৭৯) হযরত মোজাফ্ফর (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৮০) হযরত হেলিম উদ্দিন বিহারী (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৮১) হযরত হাসান উদ্দিন বিহারী (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৮২) হযরত আদম খাকী (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৮৩) হযরত আজিম আশরাকী (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৮৪) হযরত আরিফ মুলতানী (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৮৫) হযরত আলাউদ্দিন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৮৬) হযরত আহমদ আব্বাসি (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৮৭) হযরত আহমদ নিশান বরদার (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৮৮) হযরত আবু তুরাব (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৮৯) হযরত আবুল হাসান (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৯০) হযরত আবুল খায়ের (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৯১) হযরত আবুল আদির (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৯২) হযরত আবু বক্কর (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৯৩) হযরত আব্দুল আজিজ (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৯৪) হযরত আব্দুল জলিল (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৯৫) হযরত আব্দুল মালিক (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৯৬) হযরত আব্দুস শুকুর (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৯৭) হযরত আব্দুল হেকিম (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৯৮) হযরত আব্দুল রহিম (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
১৯৯) হযরত আব্দুল মালী (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
২০০) হযরত আব্দুল আলী (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
২০১) হযরত মোহাম্মদ আনসারী (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
২০২) হযরত মোহাম্মদ আমিন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
২০৩) হযরত মোহাম্মদ আশিক (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
২০৪) হযরত মোহাম্মদ মালিক (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
২০৫) হযরত মোহাম্মদ ইয়াছিন (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
২০৬) হযরত মোহাম্মদ শহতয়াল (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
২০৭) হযরত মোহাম্মদ সালেহ (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
২০৮) হযরত মোহাম্মদ সেলাদার (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
২০৯) হযরত মোহাম্মদ জানেদী (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
২১০) হযরত মোহাম্মদ তকী (রহমাতুলি-ল আলাইহি)
২১১) হযরত মোহাম্মদ নূর (রহমাতুলি-ল আলাইহি)

(পরপর্তী সংখ্যায় দেখুন)

www.sunnibarta.com

নারায়ে তাকবির
নারায়ে রিসালাত
নারায়ে গাউছিয়া

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহু আকবার
ইয়া রাসূলাল্লাহ [ﷺ]
ইয়া গাউছুল আজম দস্তগীর

গাউসুল আজম জামে মসজিদ

প্রতিষ্ঠাতা খতীব: উস্তাজুল উলামা, শায়খুল ইসলাম- অধ্য আল্লামা হাফেজ এম.এ. জলিল (র.)

নির্মাণ ও সংস্কার চলছে

আপনিও শরিক হয়ে উভয় জাহানের কামিয়াবী হাসিল করুন।

আরজগুজার

মুহাম্মদ শাহ্ আলম, নির্বাহী সভাপতি
০১৬৭০৮২৭৫৬৮

মুহাম্মদ সাইফুদ্দীন, সেক্রেটারী
০১৫৫২৪৬৫৫৯৯

গাউসুল আজম জামে মসজিদ, শাহ্জাহানপুর, ঢাকা-১২১৭

www.sunnibarta.com